আনন্দমেলা

১৫ জুলাই ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন •
২.

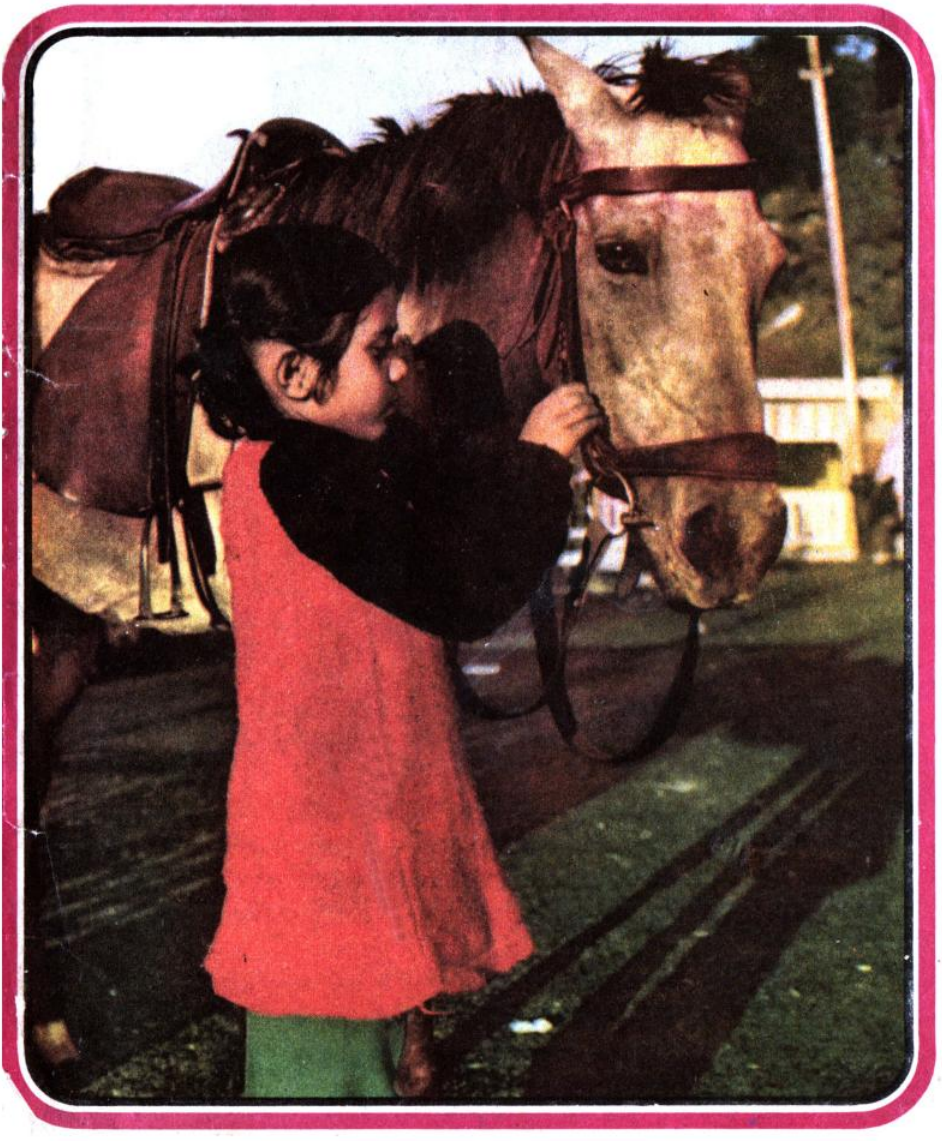

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

আনন্দমেলা

৩০ আষাঢ় ১৩৮৮ • ১৫ জুলাই ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৭ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

মহাকাশে নতুন যুগ। সুভদ্রা-উর্মিলা মজুমদার ৪

গল্প

কঞ্জুষি যাঁর আদর্শ। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ১০
ভগবানের বিধান। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬
তদন্ত চলছে। কার্তিক ঘোষ ৫২

উপন্যাস

সিসের আঙটি। বিমল কর ২১
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৭

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৭

ছড়া

বাজার গরম। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ১৫
ভুতুড়ে সার্জেন। অভীক বসু ২৭
যোগফল। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ২৭
জলবল। জীবিতেশ চক্রবর্তী ৫৫
বীরাঙ্গনা। জয়িতা মিত্র ৫৮

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৫৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

শান্ত এখন অশান্ত। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
ইওরোপের সেরা ফুটবল। আশিস রায় ৪৫

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২০, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১

প্রচ্ছদ : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ৯০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষণীয় পত্রিকা।

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা !

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল
পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

HTB-BCL-5641

মহাকাশে নতুন যুগ

সুভদ্রা-ঊর্মিলা মজুমদার

শুক্রবার, ১০ এপ্রিল, ১৯৮১। আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্লোরিডার ছোট শহর কেপ ক্যানাভেরালে ভোর হতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য সকলের চোখে পড়ল। ছোট্ট এই শহরটিকে মানচিত্রে খুঁজেই পাওয়া যায় না, কিন্তু শহরটি আজ ভরে গেছে হাজার-হাজার মানুষে। আরও মানুষ আসছে। ক্যানাভেরালে যাওয়ার রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি···সবাই চলেছে কেপের দিকে। ব্যাপার কী?

কলম্বিয়া, উৎক্ষেপণের আগে

মহাকাশ-বিজ্ঞান চর্চার আর একটি তীর্থক্ষেত্র হতে চলেছে এই কেপ ক্যানাভেরাল। কিন্তু অধৈর্য অপেক্ষার পরে সবাই শুনলেন, 'কলম্বিয়া'-র কমপিউটারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। আজ কলম্বিয়া মহাকাশে পাড়ি দেবে না।

রবিবার, ১২ এপ্রিল, ১৯৮১। কিছুক্ষণ আগে ভোর হয়েছে। শুক্রবারের কথা ভুলে গিয়ে আবার নতুন উৎসাহে অসংখ্য লোক অপেক্ষা করতে লাগল কলম্বিয়ার যাত্রা দেখার জন্যে। এবার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। চোখ-ধাঁধানো আগুনের ঝলক, আলো-ধোঁয়ার বন্যা আর হাজার-হাজার বাজ পড়ার মতো শব্দের মধ্য দিয়ে কলম্বিয়া যাত্রা শুরু করল মহাকাশের পথে।

কলম্বিয়ার মধ্যে দু'জন মানুষ। জন ইয়ং (৫০), আর রবার্ট ক্রিপিন (৪৩)। রবার্ট ক্রিপিনের এই প্রথম মহাকাশ-যাত্রা। তিনি এত উত্তেজিত ছিলেন যে, যাত্রার শুরুতে তাঁর নাড়ির গতি ছিল মিনিটে ১৩৫। ইয়ং অবশ্য এর আগে পাঁচবার মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর উত্তেজনা ছিল কম। নাড়ির গতি ছিল মিনিটে ৮৫।

মানুষ দু'জন ছাড়া কলম্বিয়ার মধ্যে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও ছ'টি কমপিউটার ছিল। চারটি কম্পিউটার প্রধান কাজগুলি করবে। একটি কম্পিউটার সাহায্য করবে বাকি চারটিকে। আর একটি বাড়তি। এই কম্পিউটারগুলি শুধু যে মানুষের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি কাজই করতে পারে তাই নয়, এদের চালু রাখার জন্য টার্কির মাংস, পুডিং, অক্সিজেন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

কলম্বিয়া ছুটে চলল আকাশ ভেদ করে কক্ষপথের দিকে। মাত্র আট সেকেণ্ডের মধ্যে গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় ৭৫ মাইল। ক্রিপিন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য অনুভূতি! কী অপূর্ব দৃশ্য!" উৎক্ষেপণের দু'মিনিটের মধ্যে কঠিন জ্বালানির

জন ইয়ং ও রবার্ট ক্রিপিন

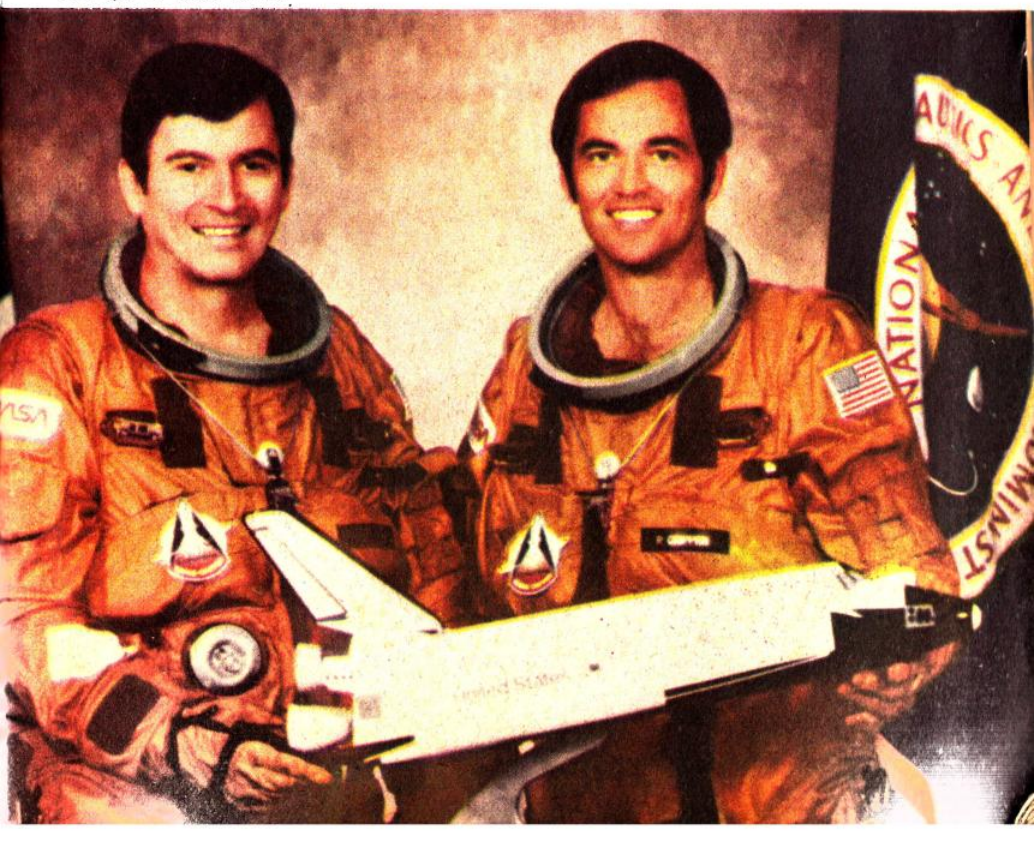

দুটি বুস্টার রকেট কলম্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে অতলান্তিক সমুদ্রে এসে পড়ল। বুস্টারগুলো আবার কাজে লাগানো হবে।

কলম্বিয়ার গতিবেগ বেড়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল। উৎক্ষেপণের সাড়ে-আট মিনিটের মধ্যে কলম্বিয়ার অতি শক্তিশালী ইঞ্জিন প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্যালন তরল জ্বালানি, অর্থাৎ তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন, ব্যবহার করেছে। তারপর জ্বালানির প্রধান ট্যাঙ্কটি কলম্বিয়া ছেড়ে পৃথিবীতে ফেরার পথে ধ্বংস হয়ে যায়।

ক্রিপিন তখনও খুবই উত্তেজিত। কলম্বিয়ার জানলায় বাইরে তাকিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল : জন ইয়ং আমাকে তিন বছর ধরে এর কথাই বলেছে। কিন্তু এ দৃশ্য এত সুন্দর যে, তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আর এত সুন্দর দৃশ্য দেখে কক্‌পিটের মধ্যে বসে কাজ করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

তারপর শুরু হল পৃথিবী পরিক্রমণ।

জন ইয়ং

কলম্বিয়া সাড়ে-চুয়ান্ন ঘণ্টায় পৃথিবীর ১৫০ মাইল দূরে থেকে ৩৬ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল। এই পরিক্রমণের সময় প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছিল। এই ৫৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি, তা নয়। তবে, কম্‌পিউটারের সাহায্যে সব সমস্যারই সমাধান হয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান অবশ্য তখনও হয়নি। বড় সমস্যাটি হল নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে আসা। ক্যালিফর্নিয়ার এডওয়ার্ডস এয়ার-ফোর্স বেসে ১৪ এপ্রিল কলম্বিয়ার ফিরে আসার কথা। কিন্তু মুশকিল হল, প্রথমবারেই কলম্বিয়ার চালককে ঠিক জায়গায় মাটি ছুঁতে হবে। ভুল হলে তা শোধরানোর কোনও উপায় নেই। কারণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পরে জেট প্লেনের মতো কলম্বিয়ার ইঞ্জিনের কোনও শক্তি থাকবে না। হাওয়ার জোরে গ্লাইডারের মতো এগোবে। চালক শুধুমাত্র দিক্‌নির্ণয় করবেন। ভুল পথে গেলে কলম্বিয়াকে কিছুতেই ঠিক জায়গায় নামানো সম্ভব নয়।

ক্যালিফর্নিয়ার হাজার-হাজার মানুষের তাই উদ্বেগের আর শেষ ছিল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পরে ঘর্ষণের ফলে কলম্বিয়ার তাপমাত্রা ২,৭০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাপনিয়ন্ত্রক টালি কলম্বিয়ার দেয়ালে বসানো ছিল ফলে ইয়ং বা ক্রিপিনের কোনও অসুবিধেই হয়নি।

ক্যালিফর্নিয়ার মোহাভি মরুভূমির ওপর যখন কলম্বিয়া এসে পৌঁছল, তখন তার গতি ছিল ঘণ্টায় ২০০ মাইলের বেশি। অবতরণের ১৯ সেকেণ্ড আগে ইয়ং কলম্বিয়ার চাকাগুলো নামিয়ে দিলেন। পেছনের চাকাগুলো মাটি ছোঁয়ার ৯ সেকেণ্ডের মধ্যে সামনের চাকাগুলো মাটিতে এসে ঠেকল।

কলম্বিয়ার সফল অবতরণের পরে পৃথিবীর সব মানুষ আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। আমেরিকার রেডিও স্টেশন থেকে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। শুরু হল মহাকাশ গবেষণার নতুন যুগ। অবতরণের সময় একটি মজার জিনিস দেখা গিয়েছিল। এবার ক্রিপিনের চেয়ে ইয়ংই ছিলেন বেশি উত্তেজিত। তাঁর নাড়ির গতি ছিল মিনিটে ১৩০, আর ক্রিপিনের মাত্র ৮৫।

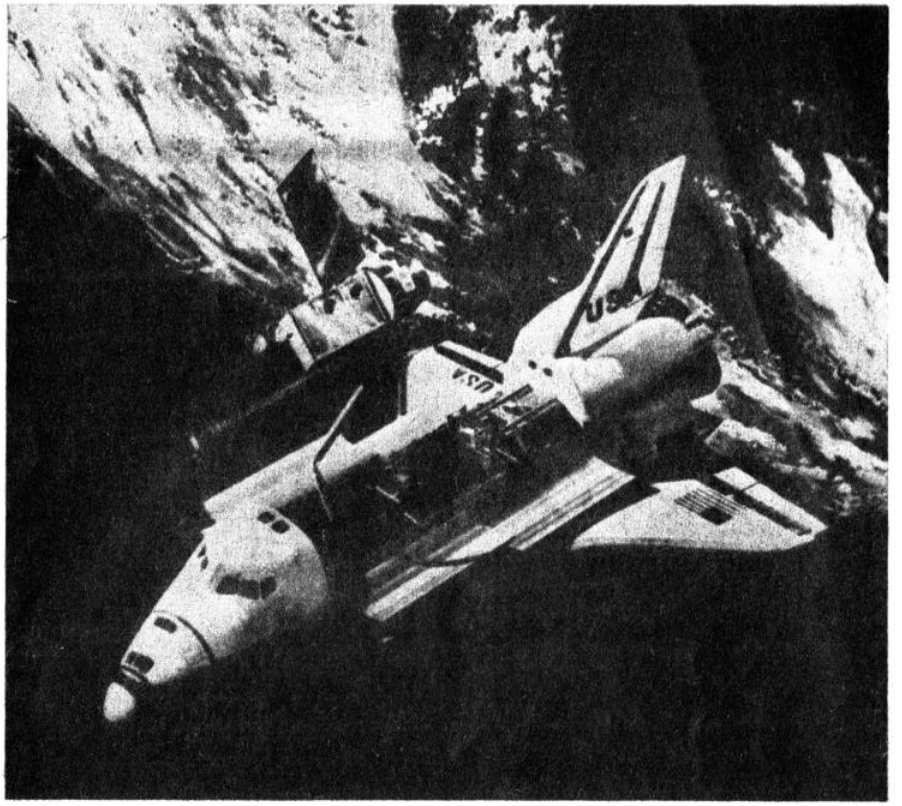

কলম্বিয়ার মডেল

অন্যান্য মহাকাশযানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, কলম্বিয়া শুধুমাত্র একটা মহাকাশযান নয়। উৎক্ষেপণের সময় এটি রকেটের মতো। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এটি মহাকাশযানের কাজ করে।

অবতরণের সময় কলম্বিয়াকে ডি-সি-১০ বিমানের মতো দেখাচ্ছিল। তবে, হাওয়ায় চালিত গ্লাইডারের মতো এটি মাটি ছোঁয়।

কলম্বিয়া শাটল বা ফেরি বাসের মতো বারবার মহাকাশে পাড়ি দিতে পারে। ফেরি বাসের মতো কলম্বিয়া দুটি স্থানের মধ্যে যাতায়াত করে বলে কলম্বিয়া হল স্পেস শাটল। জায়গা দুটি পৃথিবী আর মহাকাশ।

কলম্বিয়ার প্রথম যাত্রা সফল হয়েছে। "নাসা"-র পরিকল্পনা অনুসারে এ-বছরের সেপ্টেম্বরে কলম্বিয়ার দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক যাত্রা। এই রকম মোট চারবার যাত্রার পরে ১৯৮৫ সালে কলম্বিয়া স্পেস শাটল হিসেবে কাজ শুরু করবে।

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা মহাকাশে গবেষণার জন্য তৈরি করছে স্পেস ল্যাব বা মহাকাশ গবেষণাগার। স্কাইল্যাব নয় কিন্তু। স্কাইল্যাব ছিল পরিক্রমণকারী একটি মহাকাশ কেন্দ্র। এটি ১৯৭৯ সালে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই মহাকাশ গবেষণাগারকে কলম্বিয়ার ভেতরে করে নিয়ে যাওয়া হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। তারপর পরীক্ষা করে দেখা হবে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে গাছপালা আর প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে কি না! সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই কিন্তু বড়-বড় সংস্থা করবে না। আমেরিকার একটা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওপর ভার পড়েছে শিপড়ের একটা কলোনিকে মহাকাশে পাঠানোর। এই জাতীয় আরও অনেক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে।

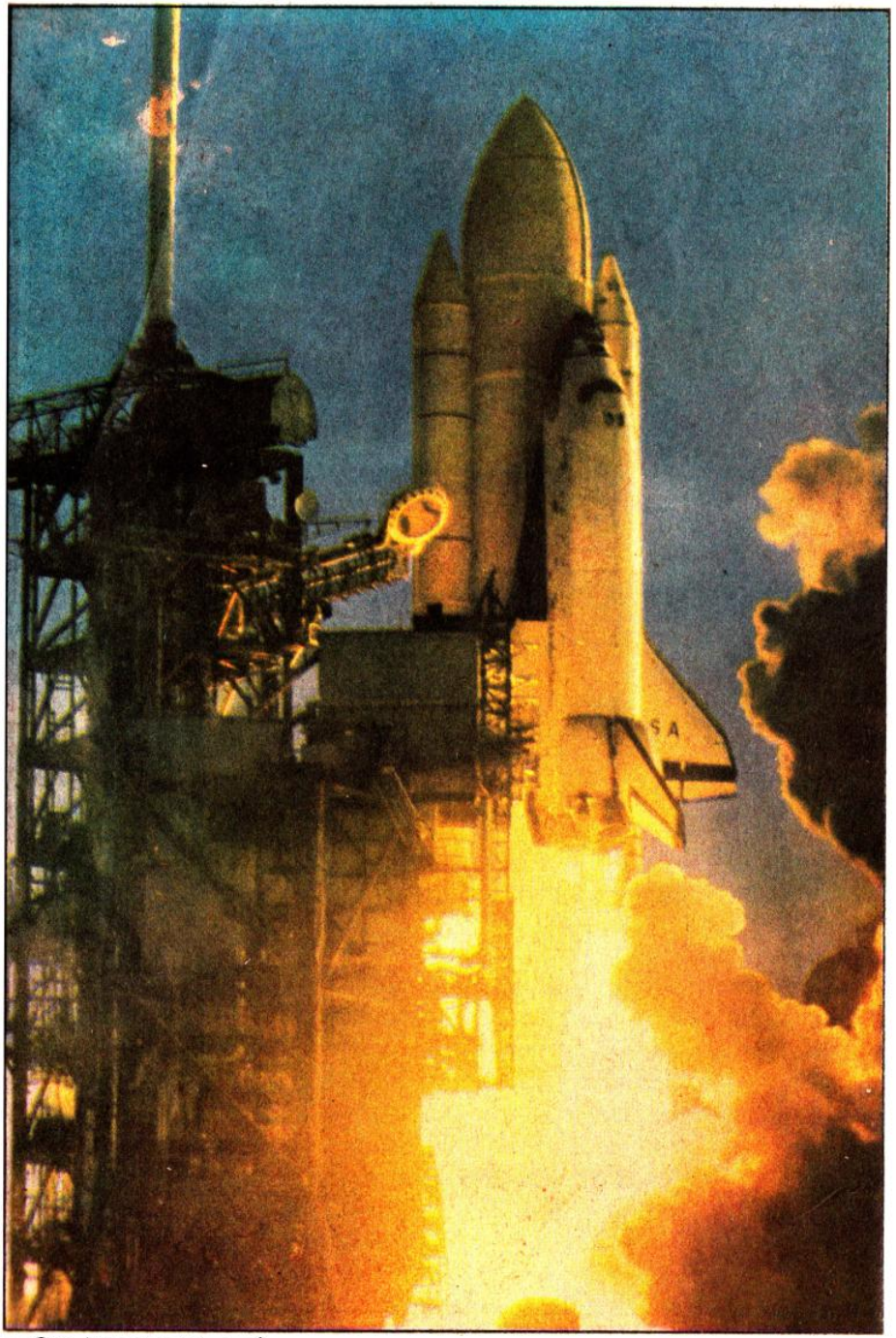

কলম্বিয়া, উৎক্ষেপণের পরমুহূর্তে

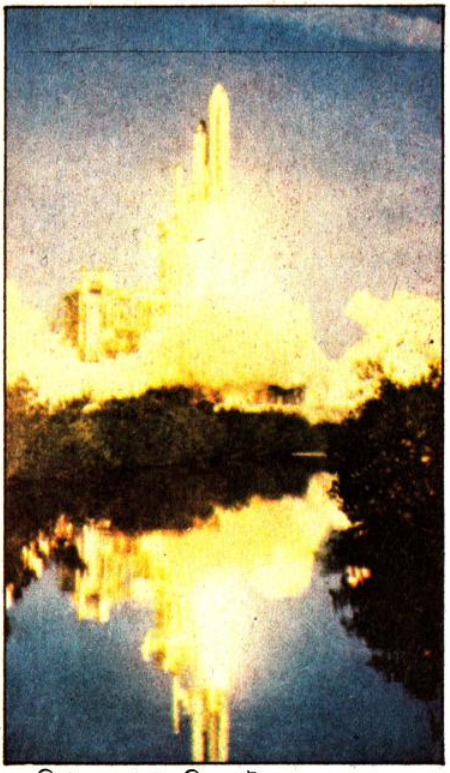

কলম্বিয়া, কক্ষপথের দিকে ছুটছে

১৯৮৫ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যাবে কলম্বিয়া। বিরাট এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সীমান্ত পর্যন্ত দেখার সুযোগ পাবে মানুষ। **কানাডিয়ান** রোবট **আর্ম** নামে একটি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। এর সাহায্যে মহাকাশ থেকে খারাপ-হয়ে-যাওয়া কৃত্রিম উপগ্রহ তুলে নেবে কলম্বিয়া। তারপর সেই উপগ্রহটি সারাবার জন্যে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে।

শুধুমাত্র জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো নয়, মহাকাশ ফেরির সাহায্যে চিকিৎসা-বিদ্যার **উন্নতির** যথেষ্ট **সম্ভাবনা** আছে। মহাকাশে স্ফটিক, মিশ্র ধাতু ও বিশুদ্ধ ওষুধপত্র তৈরি করাও সম্ভব হবে। পৃথিবীতে যে এই জিনিসগুলি তৈরি হয় না তা নয়, তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে তৈরি হলে এগুলি হয়ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবে।

এইসব কাজের জন্য দরকার বৈজ্ঞানিকদের। ভবিষ্যতে তাই বৈজ্ঞানিকরাও কলম্বিয়ায় চেপে মহাকাশ পাড়ি দেবেন। আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রতি বছরে গড়ে ৪৪ বার **কলম্বিয়া** মহাকাশে যাত্রা করবে। এই যাত্রা এবং গবেষণার সুফল ভোগ করবে মানুষ।

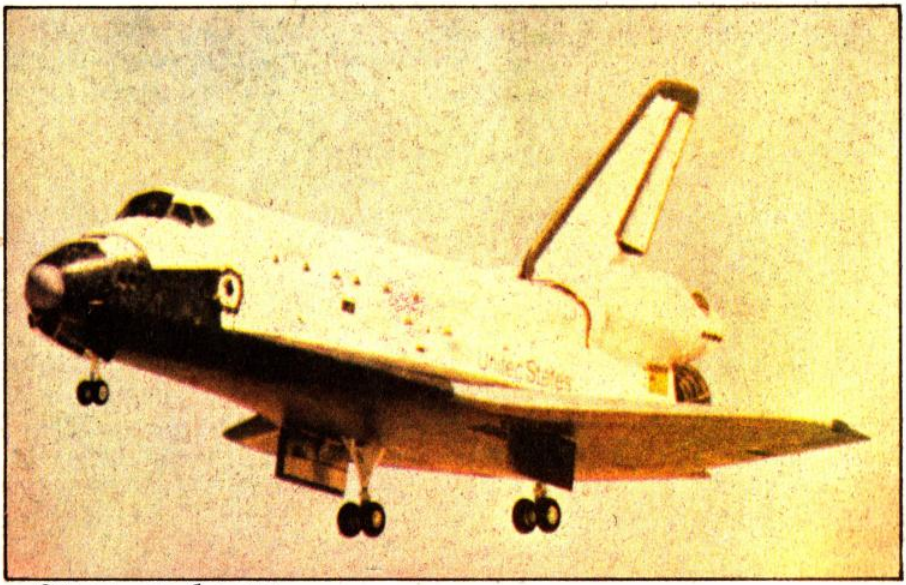

কলম্বিয়া, অবতরণের ঠিক আগে

কঞ্জুষি যাঁর আদর্শ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

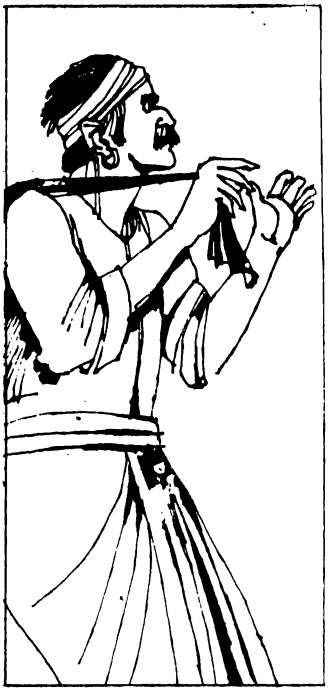

শেঠজির এত বয়স হল, কিন্তু তাঁর কখনও অসুখ করেনি। বোধকরি শুধু সুখে কারও জীবন কাটে না। শেষ পর্যন্ত একবার শেঠজির অসুখ করল। ভীষণ অসুখ। হলে কী হবে! শেঠজি তো আর কবিরাজ ডাকবেন না। কবিরাজ ডাকলেই খরচ।

শেঠানি কবিরাজ ডাকার জন্য অনেক পেড়াপিড়ি করলেন। তাতে ফল হল উলটো। খরচের ভাবনাতে শেঠের অসুখ বেড়ে গেল।

বেচারা শেঠানি। কী আর করবেন তিনি। অগতির গতি আর কে আছে! ঘরের দেওয়ালে কুলুঙ্গি, তাতে শেঠানির ঠাকুর পুজোর ব্যবস্থা। ঠাকুরের কাছে শেঠানি কেঁদে পড়লেন, "তুমি ছাড়া ওঁকে আর কে রক্ষে করতে পারে? মুখ তুলে তাকাও, ওঁকে ভাল করে দাও।"

সেদিন রাত্তিরে শেঠানি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্মী দেবী বললেন, "শেঠ যদি কথা দেয়, সেরে গিয়ে বাণগঙ্গার জলে স্নান করে আসবে তাহলে শেঠ সেরে যাবে।"

কী আশ্চর্য! শেঠানির সেই মানতের জোরেই হয়ত আস্তে আস্তে শেঠানি সেরে উঠতে লাগলেন।

অনেক অসুখেরই একটা বাঁধা মেয়াদ থাকে। হয়ত অসুখটার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেই শেঠজি সেরে উঠলেন। কিন্তু শেঠানির ধারণা হল, তাঁর মানতের ফলেই শেঠজির অসুখ সারল।

কতদিন ঠাকুরের ঠিক মতো সেবাযত্ন করা হয়নি, ধাতুর তৈরি মূর্তি, পুজো করার বাসনপত্র—সব কেমন ময়লা-কালচে হয়ে গেছে। একদিন সকালে শেঠানি ঠাকুরের মূর্তি আর পুজোর বাসনপত্র নিয়ে উঠোনে বসে পরিষ্কার করতে লাগলেন।

এমন সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শেঠজি। তাকিয়ে দেখলেন, শেঠানি খুব ঘষে ঘষে সব কিছু পরিষ্কার করছেন। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, "কতবার তোমায় বলেছি, ওভাবে রগড়ে রগড়ে জিনিসপত্র মাজবে না।"

কোনও উত্তর দিলেন না শেঠানি। তিনি তো জানেন, তাঁর স্বামী কী রকম কঞ্জুষ। মূর্তি, বাসনপত্র—এসব যে এভাবেই সাফ করতে হয় এটা তাঁকে বোঝানো যাবে না। তাঁর ধারণা, এতে সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

শেঠজি আবার বললেন, "কান খুলে ভাল করে শুনে নাও, তোমার ঠাকুর-ফাকুর একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর কিনে আনতে পারব না।"

বিরক্ত হয়ে শেঠানি ফিরে তাকালেন শেঠজির

দিকে। তাকিয়েই অবাক। শেঠজি যে বাইরে যাওয়ার সাজপোশাক পরে একদম তৈরি। "কী কোথায় বেরচ্ছ তুমি?"

"বাঃ, দোকান কবে থেকে বন্ধ পড়ে আছে!" শেঠজি বললেন।

"কিন্তু তুমি না কথা দিয়েছিলে," **শেঠানি** মনে করিয়ে দিলেন, "বাণগঙ্গাতে স্নান না করে তুমি কামাইয়ে বেরোবে না।"

"কামাই না করলে বাণগঙ্গাতে যাব কী করে?" শেঠজির মুখে মুখে উত্তর। "চার দিনের পথ। কত খরচ। কামাই না করলে খরচের টাকা আসবে কোথা থেকে।" শেঠজি যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পথ আগলালেন **শেঠানি**। "মানত করার সময় এসব মনে ছিল না? এখন বলছ কামাই না করলে খরচ আসবে কোথা থেকে? আমি কিছুতেই তোমায় দোকানে যেতে দেব না।"

শেঠজি দেখলেন বেগতিক। **শেঠানি** বেজায় গোঁ ধরেছেন। স্ত্রীকে ভোলাবার জন্য হেসে বললেন, "পাগলি কোথাকার। বাণগঙ্গাতে বর্ষার জল, গাঁয়ের পুকুরেও বর্ষার জল। বলো তো পুকুরটাতে দশবার স্নান করে আসি। তাতে পুণ্যও দশগুণ বেশি হবে।"

আরও রেগে গেলেন **শেঠানি**। দেব-দেবীর কাছে মানত নিয়ে হাসিঠাট্টা! ভীষণ রেগে বললেন, "তাহলে তুমিও কান খুলে শুনে নাও, যতদিন তুমি বাণগঙ্গাতে না যাচ্ছ ততদিন আমিও কিচ্ছু খাব না।"

শেঠজি আর রাগাতে চাননি **শেঠানি**কে। তবু তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ভালই তো—তোমার খাওয়া-খরচটা বাঁচবে।"

রাগে দিগ্বিদিক হারিয়ে **শেঠানি** এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, "মুখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেব না।"

শেঠ ভাবলেন, রাগের মাথাতে কী বলতে কী বলেছে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু দু-তিনদিনের মধ্যেই **শেঠানি**র এমন হাল হল যে দেখে কষ্ট হয়। তবু নিজেকে মনে মনে শেঠ বোঝালেন, আর **একটু** কষ্ট বাড়লে শেঠানি আপনিই উঠে জল খাবে, খাবার খাবে। আরও দুদিন গেল। **শেঠানি**র দশা আর চোখে দেখা যায় না।

শেষ পর্যন্ত জেদাজেদির পাল্লাতে শেঠেরই হার হল।

লোটা-কম্বল নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লেন বাণগঙ্গার পথে।

পথ অল্প নয়।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

রাজস্থানের মরুভূমি। মাইলের পর মাইল ছড়ানো বালি। শুধু ধূধূ বালি নয়, মধ্যে মধ্যে খিজরি কণ্টিকারির ঝোপঝাড়। মরুভূমির গাছপালা তো—যেমন বেঁটেখাটো, তেমনই ঝিরিঝিরি পাতা। রোদ্দুরের সময় সেসব ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়েও রোদ্দুর গলে আসে, সেগুলোর ছায়াতে আশ্রয় নেওয়া না নেওয়া সমান। বালির ফাঁকে-ফাঁকে কাঁকর আর কাঁটা। তার উপরে রোদ্দুরে তেতে সে বালি উনুনের উপর লোহার চাটুর মতোই গরম। ভাগ্যিস পায়ে জুতো আছে। জুতো ছাড়া এই এলাকাতে হাঁটাচলা করা অসম্ভব।

আর রাত্তিরে তেমনই শীত। কালো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে লক্ষ-লক্ষ তারা। যত রাত্তির বাড়ে তত মনে হয়, তারাগুলো যেন আসলে তারা নয়, আকাশ ভরে ছড়ানো লক্ষ-লক্ষ বরফের কুচি। আরও যখন রাত্তির বাড়ে তখন মনে হয়, বরফের কুচিগুলো আরও জ্বলজ্বল করছে, আরও নেমে আসছে, একেবারে পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে। শীতের চোটে শেঠজি পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া কম্বলে ঢেকে নেন। তারার কুচিগুলো গায়ের উপরে নেমে এসেছে কিনা কম্বল থেকে মুখ বের করে তা দেখার সাহস হয় না।

ঘুম ভাঙে ময়ূরের ডাকে। কী তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার করতে পারে ময়ূরগুলো। আবার হাঁটতে শুরু করেন শেঠজি। কখনও বুনো কুল খেয়ে পেট ভরান, আবার কখনও কারও কারও লঙ্কার ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লঙ্কা ছিঁড়ে নেন—কিছু লঙ্কা জেবে পোরেন, কিছু পেটে। লঙ্কাগুলো আকারে বেশ বড়, কিন্তু তেমন ঝাল নয়। এই লঙ্কা পেকে যখন লাল হবে, ভাল করে শুকিয়ে নেওয়ার পরে যখন আকারে অনেক ছোট হয়ে যাবে, তখন এগুলোর ঝাল বোঝা যাবে। বাংলা, বিহার, আসাম—আরও কত সব মুলুকে চালান হয়ে যাবে শুকনো **লঙ্কাগুলো**। শুধু লঙ্কার কারবার করেই শেঠজি কম রোজগার করছেন নাকি।

যা **হোক**, এভাবে চার দিন চার রাত ধরে হেঁটে হেঁটে শেঠজি তো এসে পৌঁছলেন বাণগঙ্গাতে। চারধারে পাথর বাঁধানো ঘাট। ঘাটের উপরে মন্দির আর নানা রকম গাছপালা—বট অশথ পাকুড় আম। সেসব গাছ যেমন উঁচু তেমনই সেগুলোর বড়-বড় পাতা। পাতার আড়ালে আড়ালে নানারকম **পাখির** কলকলানি। ওদিকের একটা মন্দিরের মাথায় একটা ময়ূর বসে। যারা পুণ্য করতে এসেছে তারা স্নান করছে, পাণ্ডারা তদারকি করছে, বাণগঙ্গার জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে কতকগুলো কচ্ছপ।

কোথাও কোনও ভয়ডরের চিহ্ন নেই।

কিন্তু ওই যে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ফোঁটা-তিলক— **ওই** পাণ্ডাদের দেখেই শেঠজির ভয় করল। ওরে বাবা, পাণ্ডাদের খপ্পরে একবার পড়লে আর রক্ষে আছে। কিছু-না -কিছু খরচ না করিয়ে ছাড়বে না। শেঠজি ঠিক করলেন, পরদিন খুব ভোরে এসে, পাণ্ডারা ঘাটে আসার আগেই, স্নান করবেন। জল খুব ঠাণ্ডা থাকবে, খুব শীত করবে—তা করুক। পাণ্ডাদের হাত থেকে তো রেহাই মিলবে—খরচ তো বাঁচবে।

ওদিকে বৈকুণ্ঠ **থেকে** লক্ষ্মী দেবী তাঁর পরম ভক্ত শেঠের কাণ্ড দেখছিলেন। শেঠের মনের কথা তিনি সব বুঝতে পারলেন। মুচকি হেসে ভাবলেন, দেখতে হচ্ছে শেঠ আমার **কত** বড় ভক্ত। ভোর বেলাতে তিনি নিজেই পাণ্ডা সেজে যাবেন শেঠকে পরীক্ষা করতে।

কাকপক্ষী ডাকার আগে আধো অন্ধকারে বাণগঙ্গার ঘাট যখন একেবারে ফাঁকা, শেঠজি এসে দাঁড়ালেন ঘাটে। ঝপাঝপ কয়েকটা ডব দিয়ে শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে যেই উঠেছেন ঘাটে, অমনই দেখেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা পাণ্ডা মিটিমিটি হাসছে। "আরে, এত সকালে এসে গেছ?"

পাণ্ডা হেসে বলল, "কী করব, শেঠজি, এ-ই তো আমার ধান্দা। রোজগার না করলে আমার চলবে কী করে?"

শেঠজি বললেন, "বা রে বা, লক্ষ্মীর ভক্ত, তোমার ভক্তির তারিফ করছি।"

কিন্তু শুধু তারিফে লক্ষ্মী খুশি হন না, পাণ্ডা উত্তরে বলল, "আপনার হাত থেকে আজ সোনার মোহর না নিয়ে ছাড়ছিনে।"

জামাকাপড় পরতে পরতে শেঠজি বললেন, "সোনার মোহর?"

শেঠজির মুখের ভাব দেখে পাণ্ডা বলল, "আচ্ছা, সোনার মোহর না হোক, একটা রুপোর টাকা দিন।"

কোনও উত্তর না দিয়ে শেঠজি কম্বলটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেললেন।

পাণ্ডা আবার বলল, "বেশ, একটা তামার পয়সা অন্তত দিয়ে যান।"

"**শাবাশ**, এভাবে চাইতে থাকো, চাওয়াটাই তোমার কাজ," **বলে** শেঠজি ঘাটের ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বললেন, "নিজের কাজ করে যাও। কিন্তু আমার কাছে কিছু পাবে না।"

পাণ্ডাও তেমনই নাছোড়বান্দা। শেঠজির পিছু পিছু চলল সে। চলতে চলতে বলল, "আর **কিছু না**

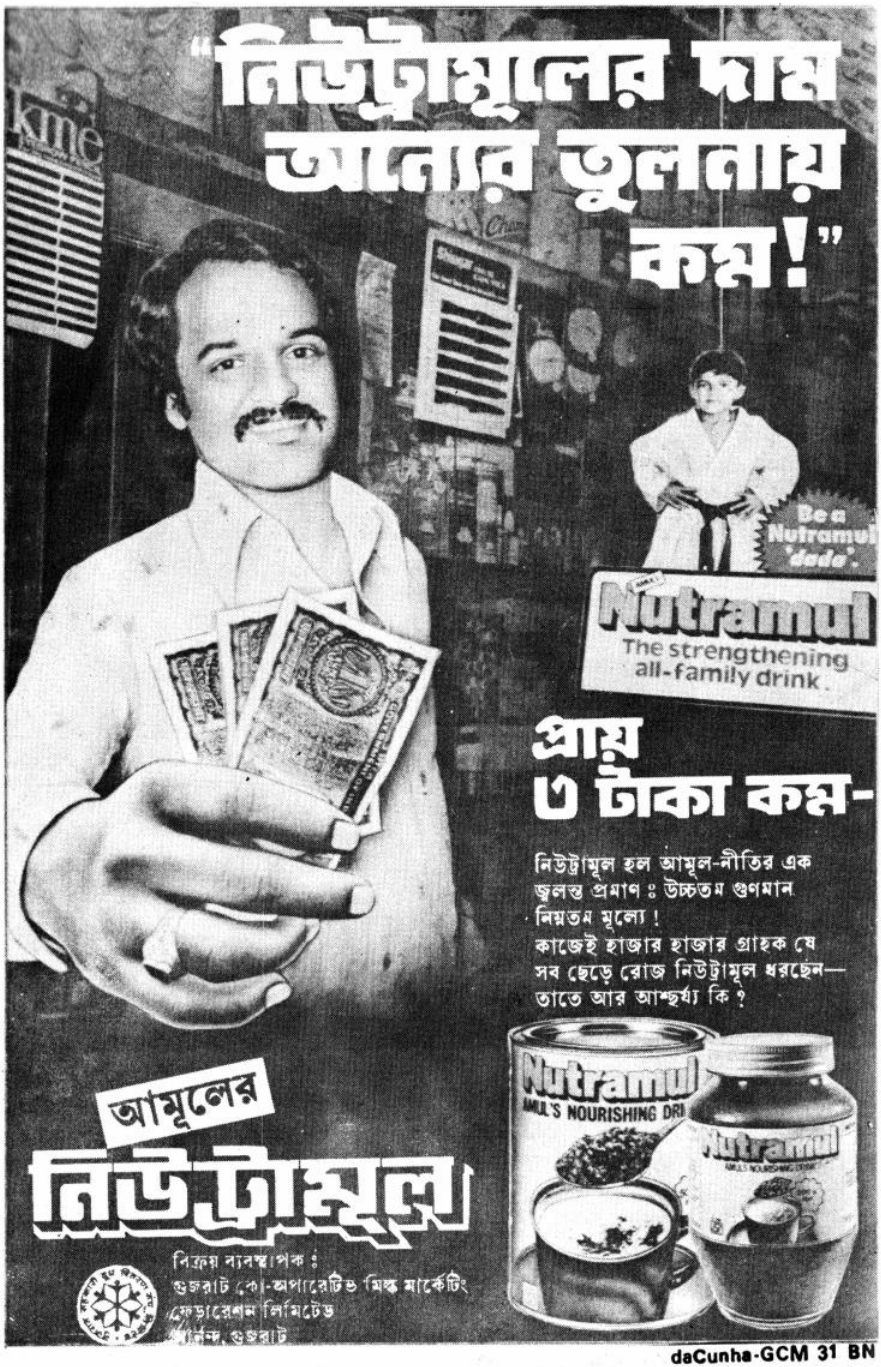

daCunha-GCM 31 BN

দিন, এক মুঠো ধুলো অন্তত দিয়ে যান।"

এবার পিছু ফিরে দাঁড়ালেন শেঠজি। বললেন, "দেওয়ার নামে আমি কাউকে গালি পর্যন্ত দিই না তো মুঠো ভরে ধুলো দেব কী করে? লোকের কাছ থেকে নেওয়াটাই আমার কাজ—দেওয়া নয়।" বলে শেঠজি আবার হাঁটতে লাগলেন।

পাণ্ডা বলল, "কিন্তু লোকের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়াটাই আমার কাজ, ওটাই আমার কর্তব্য ।" তারপর শেঠজির মন নরম করার জন্যে বলল, "আপনার মতো বড় শেঠজি যদি আমার কর্তব্য করতে না দেন তাহলে যে কর্তব্য না করার পাপ হবে।"

থমকে দাঁড়ালেন শেঠজি। ভেবে দেখলেন, পাণ্ডাটা ভুল কথা বলেনি। নিজের কাজ না করাই মানুষের সবচেয়ে বড় পাপ। বললেন, "আচ্ছা, যদি একদিন আমার গাঁয়ে আমার বাড়ি আসো তাহলে নিশ্চয়ই একবেলা খাবার পাবে।"

শেঠজি তো আর জানেন না, এ পাণ্ডা সাধারণ পাণ্ডা নয়, পাণ্ডা আসলে লক্ষ্মী দেবী নিজে। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। চার দিন চার রাতের পথ ভেঙে পাণ্ডাও এসেছে, একবেলা খাবারও পেয়েছে! শেঠানির কাছে খুব বুক ফুলিয়ে বললেন, কী ভাবে এক কানাকড়িও খরচ না করে তিনি বাণগঙ্গার থেকে ফিরে এসেছেন, কী ভাবে পাণ্ডার হাত থেকেও রেহাই পেয়ে এসেছেন।

পরদিন। সকালবেলা। শেঠানি গোরুকে জাবনা দিচ্ছেন।

"জয় বাণগঙ্গামাই।"

শেঠানি পেছন ফিরে দেখলেন, একজন পাণ্ডা। অবাক কাণ্ড! পাণ্ডা আসার কোনও সাড়াশব্দ তো তিনি শুনতে পাননি।

পাণ্ডা বলল, "শেঠজি আমায় কথা দিয়ে এসেছিলেন, এখানে এলে একবেলার খাবার পাব।"

"ও, আপনিই সেই পাণ্ডা?" শেঠানি বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি।"

শেঠানির মুখে পাণ্ডার আসার কথা শুনে শেঠজিও কম অবাক হলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, পাণ্ডা কখনও আসবে না। এখন উপায়? বেধকরি হতাশাতেই শেঠজি বিছানাতে শুয়ে পড়লেন।

"শুয়ে পড়লে কেন?"শেঠানি তাড়া দিয়ে বললেন, "যাও, পাণ্ডার কী ব্যবস্থা করবে করো।"

শুয়ে শুয়ে শেঠ বললেন, "পাণ্ডাকে গিয়ে বলো, শেঠের ভীষণ অসুখ করেছে—বিছানা থেকে উঠতে পারছে না।"

শেঠানির মুখে কথাটা শুনে পাণ্ডা মুচকি হেসে

বাজার গরম

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

বাজার করার হাজার ঠেলা
নরম নোটের গরম খেলা!
আলুর হল ভালুর জ্বর
বাড়ছে গরম, চড়ছে দর!
উচ্ছে, পটল, কাঁকুড়, ঝিঙে,
দর চড়িয়ে ফুঁকছে শিঙে।
বরফ-ঠাণ্ডা, পচা, নরম
চিংড়ি পুঁটি তারাও গরম!
ফোড়ন লঙ্কা ছাড়াই ডাল
কিনতে গেলেই লাগছে ঝাল!
কচি আমড়া পাকা আম
হাত দেব কী, আগুন দাম!
তেতে পুড়ে বাজার করে,
খালি থলি, ফিরছি ঘরে।
বোশেখ-জষ্ঠির এই তো হাল
বাজার গরম, গরম কাল!

ছবি দেবাশিস দেব

বলল, "এজন্যে আর ভাবনা কী? আমি বরং কাল সকালে আসব—উনি আমার খাস শেঠ, কাল এসে কী রকম থাকেন না থাকেন খবর নিয়ে যাব।"

পাণ্ডা আবার কাল সকালে আসবে শুনে শেঠজি ভাবনায় পড়লেন। ভেবেচিন্তে শেষে একটা ফন্দি ঠাওরালেন। বললেন, "কাল সকালে যখন পাণ্ডা আসবে, তুমি আর বেরিও না। ঘরের মধ্যে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করবে। আর চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে পাণ্ডাকে বলে আসবে, শেঠজি মারা গেছে।"

চাকরের মুখে শেঠজির মৃত্যুর খবর পেয়ে পাণ্ডাও হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। "হায়, হায়, উনি যে আমার খাস শেঠ ছিলেন। এখন কী করি? কোথায় যাই? ঠিক আছে চলো, আমার শেঠজির সঙ্গে সঙ্গে আমিও শ্মশান পর্যন্ত যাব।"

পাণ্ডার কথা শুনে চাকরটার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ! এই পাণ্ডা এখন যদি শ্মশান পর্যন্ত যায় তাহলে তো তার মনিবের সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবে। ছুটতে ছুটতে মনিবের কাছে এসে বলল, "শেঠজি, শেঠজি, ওই পাণ্ডা বলছে, শ্মশানেও যাবে।"

আঁতকে উঠলেন শেঠানি। "কী হবে তাহলে?"

"এতে ঘাবড়াবার কী আছে? যেতে চাইছে, চলুক," বললেন শেঠজি। তাঁর চোখেমুখে কি গলার স্বরে কোনও বিকার নেই।

"কিন্তু শেঠজি," চাকর বলল, "শ্মশান পর্যন্ত গেলে পাণ্ডা যে সব ধরে ফেলবে!"

শেঠজি তেমনই নির্বিকার ভাবে বললেন, "কিছুই ধরতে পারবে না। লোকজন ডাকো, মাচা তৈরি করো, আমায় চিতায় তুলে দাও—"

"কিন্তু আমি এসব কী করে সহ্য করব?" শেঠজিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সত্যিই কেঁদে ফেললেন শেঠানি।

"এর মধ্যে সহ্য করা না করার কী আছে? কঞ্জুষিই হল আমার আদর্শ। পৃথিবীতে আমি সেই আদর্শ রেখে যাব।" বলে শেঠজি ফিরে তাকালেন চাকরের দিকে, বললেন, "দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করো।"

শেঠ-শেঠানির কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই চাকরটাকেই সব ব্যবস্থা করতে হল। গাঁয়ের লোকেরা একে একে শেঠের বাড়িতে জড়ো হল। তারা ভাবল, যাক, শেঠ মরে গাঁ জুড়োল। লোকটা বেজায় কঞ্জুষ ছিল। অমন হাড়-কঞ্জুষের মৃত্যুতে কার মনেই বা সত্যিকার দুঃখ হয়! আর অমন একটা কঞ্জুষের মুখাগ্নি করতেই বা কে রাজি হবে। গাঁয়ের লোকেরা বলল, ওই চাকরটার যখন অত দুঃখ হয়েছে তখন ও-ই মুখাগ্নি করুক।

চিতা সাজানো হল। তার উপর তুলে দেওয়া হল শেঠের দেহ।

কতকগুলো শুকনো নলখাগড়াতে আগুন ধরানো হল। গাঁয়ের লোকেদের দূরে যেতে বলল চাকরটা। তারপর জ্বলন্ত খাগড়াগুলো নিয়ে সে চিতার মাথার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "শেঠজি, আর একবার ভেবে দেখুন—পাণ্ডাকে একবেলার খাবার দেওয়া নিয়েই তো কথা—আমি সে খাবার দিয়ে দেব।"

"না হে, ছোকরা, না," তেমনই ফিসফিস করে শেঠজি বললেন, "আসল কথা হল আদর্শ। আমার আদর্শ আমায় রাখতে দাও। আগুন লাগাও।"

চাকরটা তখন কী আর করে। একবার গাঁয়ের লোকেদের দিকে তাকাল। ওই যে, ওদের মধ্যে সেই পাণ্ডাটা দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে, নাকি কান্না চাপার চেষ্টাতে মুখটা অমন দেখাচ্ছে! ওরই জন্যে এত কাণ্ড। চাকরটা চিতাতে আগুন ধরাল।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখাগুলো লকলক করছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি বা চাকরটাকেও ধরতে চাইছে। ভয় পেয়ে সে সরে গেল ওদিকটাতে—গাঁয়ের লোকেরা যেদিকে দাঁড়িয়েছে। তার পাশেই সেই পাণ্ডাটা দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হল পাণ্ডাটাকে ধরে ওই আগুনের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

ঠিক তখনই পাণ্ডা মিলিয়ে গেল বাতাসে। আর সঙ্গে সঙ্গে দপ করে নিবে গেল চিতার আগুন।

আকাশ থেকে শোনা গেল লক্ষ্মী দেবীর গলা। "বৎস, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হয়েছি। এবার ওঠো।"

চিতার উপর উঠে বসলেন শেঠজি। হাত জোড় করে তাকালেন উপরে। তাঁর দেখাদেখি সকলে হাত জোড় করে উপরে তাকাল।

"তোমায় পরীক্ষা করার জন্যে আমিই পাণ্ডার রূপ ধরে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। কঞ্জুষির অপূর্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মানুষ যুগ যুগ তোমার কথা মনে রাখবে। বলো, কী বর তুমি চাও?"

শেঠজি বললেন, "পাণ্ডাকে যে-কথা দিয়েছিলাম তার থেকে মুক্তি পেলেই আমার সব বর পাওয়া হবে।"

"তাই হোক—পাণ্ডাকে যে-কথা দিয়েছিলে তার থেকে তুমি মুক্ত।"

ছবি অনুপ রায়

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩০ ॥

ত্রিপুরী কংগ্রেস ও তারপর ১৯৩৯-এর মে মাসে কলকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠকের মধ্যে যে সময়টুকু ছিল সেটা আমাদের দেশের **পক্ষে খুবই** গুরুত্বপূর্ণ। পরের দশকে দেশের ইতিহাসের গতি কী হবে, সেটা সেই সময়ই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বসুবাড়ির সকলকে যেটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা মুলত ছিল রাঙাকাকাবাবুর শারীরিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা। **ন'কাকাবাবু** সুধীরচন্দ্রের জামাডোবার বাড়িতে বিশ্রাম, সেবা ও চিকিৎসার ফলে তিনি **ধীরে**-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

গান্ধীজি জামাডোবায় আসতে রাজি না হওয়ায় রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদ মেটাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপ আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের ওইসব চিঠিপত্র নিয়ে আজকাল গবেষণা ও আলোচনা করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্দেশ ছিল, রাষ্ট্রপতিকে **মহাত্মা** গান্ধীজির মতানুসারে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করতে হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে গান্ধীজি কিছুতেই রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে **সহযোগিতায় রাজি** হলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল একবার জামাডোবায় এলেন, কথাবার্তাও হল, কিন্তু কাজ বিশেষ এগুল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, অল **ইণ্ডিয়া** কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের দিনকয় আগে গান্ধীজি কলকাতার কাছে **সোদপুর আশ্রমে** থাকবেন এবং সেই সময় দুজনের মধ্যে মুখোমুখি কথাবার্তা হবে। ওই সময় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাও কলকাতায় আসবেন। তাঁদেরও আলোচনার জন্য পাওয়া যাবে।

রাঙাকাকাবাবু বেশ সুস্থ হয়েই কলকাতায় ফিরলেন। নিজেই তিনি বলতেন, জীবনে কতবার কত রকম অসুখ যে তাঁর হয়েছে—তার হিসেব নেই। কিন্তু তাঁর **সেরে** ওঠার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। আবার দেখা গেল তাঁর বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল চেহারা।

বাবা তো রাঙাকাকাবাবুকে জামাডোবায় নামিয়ে চলে এসেছিলেন। ত্রিপুরীতে রাজনীতির যে চেহারা তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন সেটা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। গান্ধীজিকেও তিনি এ-বিষয়ে বেশ তীব্র ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। এই সূত্রে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর অন্তরের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলি। বাবার নিজের জীবনেও তো অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অনেক অন্যায়, অবিচার, অসদ্ব্যবহার, ঈর্ষাপ্রসূত শত্রুতা তিনি অবিচলিত চিত্তে সহ্য করেছেন। তা সে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মী, যে-দিক থেকেই আসুক না কেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে যা তিনি শান্তভাবে মুচকি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, ভাই সুভাষের ক্ষেত্রে তা পারতেন না।

সুভাষের প্রতি কেউ কোনও অবিচার বা অন্যায় করেছে—এটা যদি তাঁর মনে গেঁথে যেত একবার, তিনি আর অবিচল থাকতে পারতেন না। তীব্র ভাষায় এবং জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ ও প্রতি-আক্রমণ করতেন। রাঙাকাকাবাবুর প্রতি তাঁর মনের ভাব সম্বন্ধে আমরা দু-ধরনের কথা শুনতাম।—এক, সুভাষকেই তিনি নিজের বড় ছেলের স্থান দিয়েছিলেন, এবং তাঁর দাবি ছিল অনস্বীকার্য। দুই, নিজের ছেলেদের চেয়েও তিনি সুভাষকে বেশি **ভালবাসতেন**। আমাদের কিন্তু এতে হিংসা হত না, গৌরবই হত।

পরে, যুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুর বিদেশের কার্যকলাপ নিয়ে অনেকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছিলেন, অনেকে তো কুৎসা রটনা করতেও ইতস্তত করেননি। এদের বাবা মনে-মনে কোন-দিনও ক্ষমা করতে পারেননি। আমার মনে হয়, এর কারণ ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা। শুধু তাই নয়, রাঙাকাকাবাবুর **নিঃস্বার্থ**

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

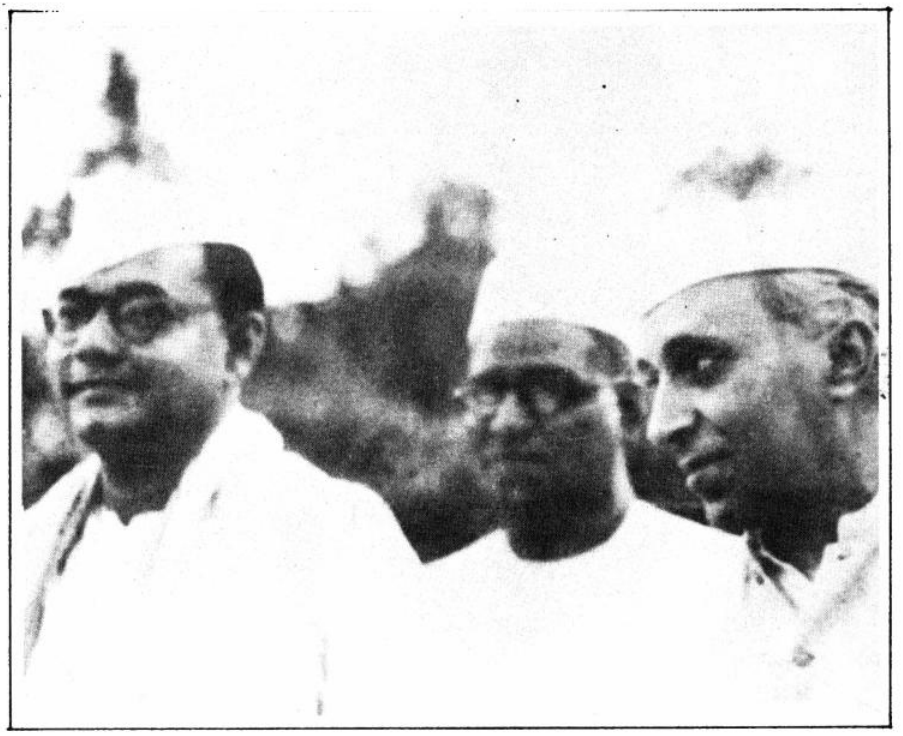

সোদপুরে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল (১৯৩৯)

দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রতিভা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের তুলনা তিনি সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখেননি। বড় ভাই ছোট ভাইকে বুক ফুলিয়ে নেতা বলে স্বীকার করছেন—এ নজির ইতিহাসে আর আছে কি না সন্দেহ!

১৯৩৯-এর মে মাসে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের দিনকয় আগে গান্ধীজি কলকাতায় এলেন এবং সোদপুরের আশ্রমে উঠলেন। গান্ধীজির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দীর্ঘ আলোচনা চলতে লাগল, কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্য। মনে আছে, রাঙাকাকাবাবু প্রায়ই খুব সকালে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আসতেন। পণ্ডিতজিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের 'ওয়াণ্ডারার' গাড়িতে করে সোদপুর রওনা দিতেন। এই 'ওয়াণ্ডারার' গাড়িটিকে অনেক ঐতিহাসিক কাজে লাগানো হয়েছে, নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের আগে ও পরে। আজ নেতাজি ভবনের মিউজিয়ামে গাড়িটি অন্যতম বড় আকর্ষণ।

গান্ধীজির সঙ্গে অনেক আলোচনা করেও কোনও মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। একদিন দেখি, রাঙাকাকাবাবু ও জওহরলাল একটু বেলায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ফিরে সামনের বারান্দায় গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। যেন গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে রাঙাকাকাবাবুই স্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন, "যাও, খাওয়া-দাওয়া করো, আফটার অল, ম্যান মাস্ট লিভ।"

জওহরলাল উত্তরে শুধু বললেন, "ইয়েস্, ম্যান মাস্ট লিভ।" তার পর দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যখন কংগ্রেসের সভা বসল, তখন সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত। রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, কিন্তু তিনি নিজেই প্রস্তাব করলেন, সরোজিনী নাইড সভানেত্রী হোন। কারণ, সভাপতি নিজেই এক বিতর্কের বিষয়। মনে আছে, সরোজিনী নাইড অতি সুন্দর ইংরেজিতে এক আবেগময়ী বক্তৃতা করেছিলেন রাঙাকাকাবাবুকে সভাপতির পদে বহাল থাকতে

ছবির মজা

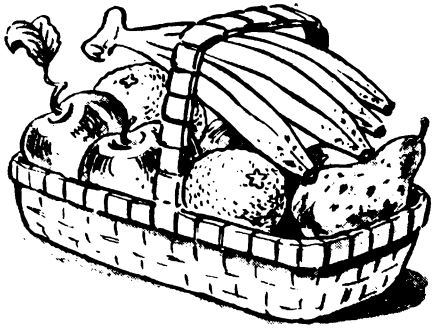

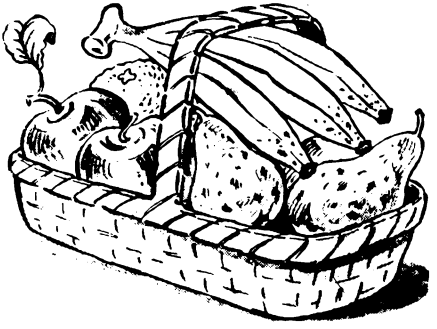

দুটি ছবি কি হুবহু এক?

(না। নীচের ছবিতে কমলালেবু কমে গিয়ে নাশপাতি বেড়েছে। কলা কমেছে। আপেলের বোঁটা ও পাতা পালটেছে।)

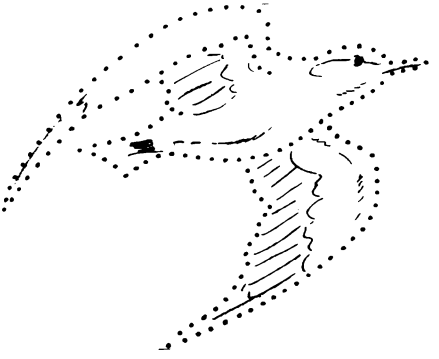

ফুটকিগুলো পরপর জুড়ে দিলেই পেয়ে যাবে উড়ন্ত গাংচিলের ছবি।

অনুরোধ জানিয়ে। তাঁর বক্তৃতার পরে অনেকেরই মনে হয়েছিল, ওই ধরনের মর্মস্পর্শী আবেদনের পরে রাঙাকাকাবাবু কী করবেন!

রাঙাকাকাবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে ধীরে ও শান্তভাবে তাঁর বিবৃতি পড়লেন। যুক্তির ভিত্তিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি যখন ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে চলতে পারছেন না, সভাপতির পদ ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে-সঙ্গে সভায়, বিশেষ করে অভ্যাগতদের মধ্যে, তীব্র আলোড়ন শুরু হল।

নতুন সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করার পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারদিকে বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। নেতাদের সভার বাইরে বের করা ও যাঁর-যাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। রাঙাকাকাবাবু স্বেচ্ছাসেবকদের একটা ব্যূহ রচনা করতে বললেন, এবং উত্তেজিত জনতাকে বারবার বলতে লাগলেন যে, বাংলার আতিথেয়তার ঐতিহ্য যেন কোনও মতে ম্লান না হয়। তিনি নিজে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে এক-এক করে আগলে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আমরা ছোটরা কয়েকজন গোলমালের মধ্যে একটু দলছাড়া হয়ে পড়েছিলাম। পাশের একটা গেট দিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে একটা গাড়ি ধরে বেশ দেরিতে বাড়ি পৌঁছিলাম। আমরা গুজব শুনেছিলাম যে, পণ্ডিত জওহরলাল নাকি ধস্তাধস্তির ফলে আঘাত পেয়েছেন। তিনি তো আবার আমাদের বাড়িতেই অতিথি। একটু ভয়ে-ভয়েই আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকতেই পণ্ডিতজির সেক্রেটারি উপাধ্যায়জির সঙ্গে দেখা। তিনি তো একগাল হেসে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলাম যে, পণ্ডিতজির কোনও আঘাত লাগেনি এবং সুস্থ শরীরেই আছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেলাম।

১৯৩৯-এর মে মাসে দেশের জাতীয় নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হল। গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ফিরে পেলেন। রাঙাকাকাবাবু একলা নিজের পথে চলতে আরম্ভ করলেন।

(ক্রমশ)

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার আসল পরিচয় কী? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে রহস্যময় মানুষ সিংহিবাবু ও সুখিয়ার খবর পায়। প্রয়াগ ও সুখিয়া কি একই লোক? বংশীকে নিয়ে সিংহিবাবুর আস্তানায় ঢুকে শিশির দেখে, বাড়ি ফাঁকা। ফিরতি পথে আক্রান্ত হয়েও শিশির বেঁচে যায়। সিংহিবাবু প্রথমে তাকে ভয় দেখান, পরে বলেন, "আমি শত্রু নই। তোমার শত্রুতা যারা করছে, তাদের আমি চিনি। তুমি চেনো না।" তারপর··

॥ ১৭ ॥

শিশির বংশীর দোকানে এসে দেখল, জনাদুয়েক খদ্দের নিয়ে বংশী ব্যস্ত। শিশিরকে বসতে বলে বংশী তার কাজ সেরে নিল।

দোকান ফাঁকা হলে বংশী বলল, "কী ব্যাপার বলো! আজ থানায় যেতে হবে।"

শিশির মনে মনে তখনও কেমন বিমূঢ় হয়ে ছিল। প্রসন্নবাবু তাকে বোবা, বোকা করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোককে সত্যিই রহস্যময় মনে হচ্ছে।

শিশির বলল, "কাল বাড়ি ফেরার পর অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।"

বংশী তাকাল। অবাক গলায় বলল, "আবার কাণ্ড?"

মাথা দোলাল শিশির। "বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি সিংহিবাবু বারান্দায় বসে আছেন।"

"বসে আছেন!"

"হ্যাঁ। খুব একচোট ঝাল ঝাড়লেন প্রথমে। থানায় যাবেন বলে ভয়ও দেখালেন।"

"কেন?"

শিশির কালকের সব কথা তাকে খুলে বলল। তারপর আজকের কথা, একটু আগে যা যা ঘটেছে সিংহিবাবুর বাড়িতে—সবই বলল।

বংশী অবাক হয়ে শুনছিল সব। যত শুনছিল ততই বোকা হয়ে যাচ্ছিল।

কথা শেষ করে শিশির চুপ করল।

বংশী থ মেরে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর মাথা পরিষ্কার করার জন্য নস্যির টিপ নিল। হাঁচল বারকয়েক। ঝট করে উঠে বাইরে চলে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে।

"সব তালগোল পাকিয়ে দিল যে।" বংশী বলল। "সিংহিবাবু সব জানেন?"

"জানেন বলেই মনে হল।"

"কেমন করে জানলেন?"

"তা বলেননি।"

ভাবল বংশী। বলল, "তোমায় যার ফটো দেখালেন—সে কে, কোথায় থাকে তাও বললেন না?"

"না।"

"আশ্চর্য।"

শিশির কোনো কথা বলল না।

বংশী সামান্য চঞ্চল হল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, দেখল আর এক খদ্দের ঢুকছে দোকানে।

খদ্দেরটি বিদায় হল সঙ্গে সঙ্গে। গুঁড়ো দুধ কিনতে এসেছিল। নেই। বংশী বলল, "সিংহিবাবুকে তোমার বিশ্বাস হয়?"

শিশির হ্যাঁ-না কিছু বলল না। "ভদ্রলোক মিষ্টিরিয়াস।"

"শুধু মিস্টিরিয়াস কেন, হয়তো তারও বেশি।"

"মানে?"

"তিনি যখন সবই জানেন তখন চুপ মেরে থাকলেন কেন! বলে দিলেই পারতেন কারা তোমার শত্রুতা করছে?"

শিশির বলল, "বললেন কোথায়?"

"আবার যেতে বলেছেন তোমায়?"

"স্পষ্ট করে নয়। তবে, সেই রকমই ভাব দেখালেন।"

চা এল কাপে। চায়ের সঙ্গে গরম শিঙাড়া।

কলকাতা ও বিজলী গ্রীল

কলকাতা ! কলকাতা !!
শুনে এই ডাক
কেউ চেরে চুল,
কেউ চুলকোয় টাক ।
কেউ বলে গোলমেলে,
কেউ বলে সাফ্—
কেউ বলে কালচারে
সাতখুন মাপ ।
কেউ বলে ঘিঞ্জিতে
সকলের সেরা,
কেউ বলে বের হলে
নেই বাড়ি ফেরা ।
কেউ বলে 'ব্যাট-বল'
কেউ 'ফুটবল'—
কেউ বলে পাবলিক
ধৈর্যে অটল ।
কেউ বলে ঘুটঘুটে
ঋণ জর্জর—
কেউ বলে প্রাণে ভরা
পরম সুন্দর ।
কেউ বলে খানাপিনা
বলতে এখানে—
চোব্যচোষ্য শুধু
কলকাতা জানে ।
শুধু এই গুণেতেই
পেয়ে যাবে থ্রীল—
কলকাতাতেই আছে
বি-জলী গ্রীল !

Bijoli Grill

কলকাতার সেরা কেটারার
৯ই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন ঃ ৪৮-২৩৬০/৪৭-৩৯২০
(আলিপুর চিড়িয়াখানা ঃ ৪৫-৪৭৯৭)

PX/BG—B1/81/O

বংশী বলল, "নাও, চা খাও। ···দ্যাখো, আমার মনে হচ্ছে, সিংহিবাবুর এটা উলটো চালও হতে পারে। মানে, তিনি আমাদের বন্ধু সেজে থাকতে চান। মুখে বন্ধু, আড়ালে শত্রু।"

শিশির কিছুই বুঝতে পারছিল না। সন্দেহ তো সকলকেই করা যায়। সিংহিবাবুকে আরও বেশি। কিন্তু সন্দেহ করে বসে থাকলে কাজের কাজ কত দূর হবে!

বাইরে বেশ রোদ। রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে। একটা বাস এল টাউন থেকে। ধুলো উড়িয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। কারা যেন চেঁচাচ্ছে। দেহাতি এক বুড়ো রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলছে কিছু। হয়তো পাগল।

বংশী বলল, "একটা কথা ঠিক। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক জায়গায় লেগে গিয়েছে। আমরা সিংহিবাবুকে ট্রেস করতে পেরেছি। এখন তিনি বন্ধু না শত্রু সেটা পরে দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কী করব এখন?"

"কেন! থানায় যাব," বংশী বলল, "যা করার এক এক করে করতে হবে।"

"থানায় যাব?"

"নিশ্চয়। ফল্‌স টেলিগ্রাম, রাত্রে সাইকেল চেপে এসে পেছন থেকে মারার চেষ্টা। এগুলো আগেভাগে লিখিয়ে রাখা ভাল।"

শিশিরেরও মনে হল, থানায় গিয়ে কথাগুলো জানিয়ে আসা ভাল।

চা খেতে খেতে আরও কিছু কথা হল। সিংহিবাবুকে নিয়েই।

সেই বুড়ো মতন লোকটি দোকানে আসতেই বংশী বলল, "কালুদা, তুমি খানিকক্ষণ থাকো। আমি বাইরে যাব।"

চা খাওয়া শেষ করে বংশী উঠে পড়ল। দোকানের একপাশে গতকালের সেই মারাত্মক অস্ত্রটা পড়ে ছিল। বলল, "চলো।"

বাইরে এসে শিশির বলল, "একটা কথা বংশী।"

"বলো?"

"থানায় সব ঘটনা বলার দরকার নেই। শুধু টেলিগ্রাম আর কালকের কথা বললেই হবে।"

বংশী কিছু ভাবল। বলল, "চলো তো থানায়, তারপর দেখা যাবে।"

দোকান থেকে থানা বেশি দূরে নয়। বেলা হয়ে উঠছিল। রোদ চড়ে গিয়েছে। রাস্তায় দুটো ট্রাক দাঁড় করানো। মাল বোঝাই।

বংশী বলল, "বুঝলে শিশির, মাত্র ক'বছর আগেও জায়গাটা কত ভাল ছিল, এখন কত রকম ব্যবসাদার, গুণ্ডা বদমাশ এসে জুটেছে। বারোটা বেজে গিয়েছে এখানকার।"

শিশিরেরও সেই রকম মনে হল।

থানার সামনেই ছোট দারোগার সঙ্গে দেখা। বংশীকে দেখে তিনি হাসলেন। "আরে বংশী!"

আলাপ করিয়ে দিল বংশী ছোট দারোগার সঙ্গে। "শিশির, এঁর কথা তোমায় বলেছি, রায়বাবু। হেমচন্দ্র রায়।"

নমস্কার করল শিশির।

শিশিরের পরিচয় দিল বংশী।

হেমবাবু মানুষটিকে মোটেই পুলিশের লোক বলে মনে হয় না। একেবারেই কাঠখোট্টা চেহারা নয়। বরং গোলগাল থলথলে গড়ন। মুখে হাসি। মাথার চুল ছোট। গোঁফ রয়েছে। চোখ দুটি অবশ্য অত সাদামাটা নয়। মনে হয়, তিনি বেশ সতর্ক চোখেই সব দেখেন।

বংশী বলল, "আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

"হাতে ওটা কী?" হেমবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"বলছি।"

"চলো, অফিসে চলো।"

হেমবাবু শিশিরদের নিয়ে অফিসে ঢুকলেন। "বোসো বংশী। বসুন আপনি।"

নিজের জায়গায় বসলেন হেমবাবু। উলটো দিকের চেয়ারে বংশী আর শিশির।

হেমবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। "বলো বংশী! কী ব্যাপার?"

বংশী শিশিরের দিকে তাকাল। "তুমি বলবে?"

"না। তুমিই বলো।"

বংশী সামান্য ভূমিকা সেরে নিয়ে কথাগুলো বলতে লাগল।

হেমবাবু এমন মুখ করে শুনছিলেন যেন তাঁর কান এখানে মন অন্য কোথাও।

বংশীর বলা শেষ হল।

হেমবাবু কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না।

শিশিররা অপেক্ষা করছিল, হেমবাবু কী বলেন শোনার জন্যে।

হেমবাবু শেষে কথা বললেন, "টেলিগ্রাম কে করেছে ধরা মুশকিল হবে না। কিন্তু কাল যে তোমাদের ওপর সাইকেল নিয়ে চড়াও হয়েছিল তাকে কি আর পাবে! সে হয়তো চম্পট দিয়েছে।"

বংশী বলল, "লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম না।"

"হুঁ! তা ওই মাথা ভাঙার অস্ত্রটা তো ভালই বানিয়েছে। ওটা রেখে যাও। এখানে দেখছি এটা ভালই চলছে।"

"মানে?"

"ও-জিনিস আরও দুটো যোগাড় হয়েছে থানায়।"

বংশী অবাক হল। তাকাল শিশিরের দিকে। হেমবাবু যেন কিছু চেপে রেখে বললেন, "তুমি বলছ, শিশিরবাবুকে জখম করতে চেয়েছিল লোকটা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?" হেমবাবু শিশিরের দিকে তাকালেন। "আপনাকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে এখানে আনানো হয়েছে বলছেন। আবার দেখা যাচ্ছে, আপনাকে জখম করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কেন? আপনি কে?"

শিশির বুঝতে পারল, দেখতে যতই হাসিখুশি হন না হেমবাবু, ভেতরে সেই পুলিশ। পেটের কথা টেনে বার করতে পারেন। কোনো জবাব না দিয়ে সে বংশীর দিকে তাকাল। যেন বলল, এবার কী হবে।

বংশী শিশিরের চোখ দেখে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বলল, "সেটাই তো কথা। কেন ওকে মিথ্যে বলে এখানে আনাল? আর কেনই বা জখম করার চেষ্টা করল।"

"আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি," হেমবাবু বললেন, "শিশিরবাবুকে এখানে আনানোর কারণটা কী?"

শিশির মাথা নাড়ল। জানি না।"

হেমবাবু শিশিরকে লক্ষ করছিলেন। গভীরভাবে। বললেন, "জানি না বললে চলবে কেমন করে! আপনাকে মশাই কলকাতা থেকে

ভুলিয়ে টেনে আনার তো একটা কারণ থাকবে।"

শিশির অসহায় বোধ করছিল। ভেতরের কথা থানায় বলতে তার ইচ্ছে নেই।

বংশী কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল। "আমরা তো সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। শিশির নিজেই বুঝতে পারছে না, কেন তাকে আনা হয়েছে।"

হেমবাবু হাসলেন। বললেন, "বুঝতে পেরেছি। বেশ, তা আমায় কী করতে হবে?"

বংশী বলল, "লোক দুটোকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন। কে ফলস্ টেলিগ্রাম করেছিল, আর কেই বা শিশিরকে জখম করতে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা! তা চেষ্টা করে দেখি। প্রথমটা পারা যাবে। দ্বিতীয়টা বোধ হয় পারা যাবে না।" বলে হেমবাবু থানার জমাদারকে ডাকলেন। তারপর নিজেই বললেন, "বংশী, তোমার ওই অস্ত্রটা থানায় জমা দিয়ে যাও।"

"আজ্ঞে, ওই জন্যেই এনেছি।"

"এই ধরনের অস্ত্র এখানে চালু হল কেমন করে ভাবছি।"

জমাদার এল। হেমবাবু ইশারায় তাকে অস্ত্রটা দেখালেন। রেখে দিতে বললেন থানায়।

"আমরা কি তাহলে কিছু লিখিয়ে যাব?" বংশী বলল।

"যেতে পারো। না, থাক···। আজ নয়। আমি শুনে রাখলাম। দরকার হলে পরে লিখিয়ে যেও।"

শিশির বুঝল এবার তাদের উঠতে হবে।

"আমরা তাহলে উঠি?"

"এসো।"

উঠে পড়ে বংশী হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলব রায়বাবু?"

"বলো?"

"রেলফটকের কাছে, পুকুরের গায়ে একটা বাড়ি আছে। বাড়িটায় সিংহিবাবু বলে এক মিষ্টিরিয়াস ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর সম্পর্কে একটু খোঁজ নেবেন?"

হেমবাবু বংশীদের মুখ দেখলেন। "কেন?"

"আমরা ভদ্রলোকের একটু খোঁজখবর নিতে চাই।"

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে হেমবাবু বললেন, "দেখি। ...তোমরা তাঁকে চেন?"

"না। মুখে আমি চিনি। শিশিরের সঙ্গে কাল আলাপ হয়েছে।"

"ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহল কেন?"

বংশী মাথা চুলকে বলল, "এমনি। পরে বলব।"

থানা থেকে বেরিয়ে এসে শিশির বলল, "তুমি ভুল করলে, বংশী!"

"কেন?"

"সিংহিবাবু যদি জানতে পারেন আমরা তাঁর পেছনে পুলিশ লাগিয়েছি—ব্যাপারটা ভাল হবে না।"

বংশী বলল, "মন্দই হোক, তবু ভদ্রলোকের ব্যাপার আমাদের জানা দরকার।" (ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

বঙ্কিমচন্দ্র একটা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিচ্ছেন। তখনকার দিনে এসব পরীক্ষা নিতেন ইংরেজরা। পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা, তারও পরীক্ষক ছিলেন কয়েকজন সাহেব। মৌখিক পরীক্ষা। এক সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়েল বাবু, বলো টো, বিপদ ও আপদ্-এর মধ্যে টফাট কী?' বঙ্কিমচন্দ্র হেসে বললেন, 'সেবার পদ্মার ওপর দিয়ে স্টীমারে ফিরছিলাম, হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল, স্টীমার ডোবে-ডোবে, সেটা হল বিপদ। আর এই যে বাঙালি হয়ে আমাকে আপনাদের কাছে বাংলা ভাষার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপদ।' সাহেবরা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে পাস করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রস্তুত হ'ল নতুন প্রেস্টীজ

১০০% সুরক্ষিত

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন-কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

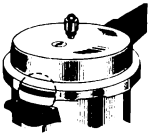

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ! এর অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

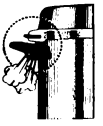

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট্-ফুট্ অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকৃত্রি-লিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝক্‌ঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্ব্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্ট্রীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

ttk উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

ভুতুড়ে সার্জেন

অভীক বসু

রাত থমথম গা ছমছম
কাঁটা গায়ের লোম-ই
মৃতদেহে অস্ত্রোপচার—
শিখছি অ্যানাটমি।
ভূতভুতুড়ে কাণ্ড সে কী
হাত কাঁপে থরথর,
মৃতের মুখে কথা ফোটে,
"আমি জাতিস্মর।
বাঘা ছিলুম সার্জেন এক
ছুরি তো নয়,বঁটি,
অস্ত্রোপচার করলে শুরু
স্তব্ধ হত ও-টি।
মাথার রোগে পা কাটতুম
পায়ের রোগে পেট,
দৃষ্টি আমার প্রখর ছিল
লক্ষ্যতে করবেট।
সার্জারিটা শিখতে হলে
আগে মোটা ফী আন,
বর্তমানে শমনরাজের
হাউস ফিজিশিয়ান।"

যোগফল

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ঘণ্টুবাবুর ঘুম আসে না
দিনরাতে একফোঁটা,
অনিদ্‌রোগে ধরল নাকি?
ভাবছে বাড়ি গোটা।
নাড়ী টিপে, টাক্‌রা দেখে
জানান শিবুবদ্যি,
"সিরাপ-সেভেন ঘুম পাড়াবে
এবং সেটা পথ্যি।"
"সাত নম্বর বোতল ফাঁকা,"
বলেন সেবকরাম।
"গোমুখ্যুরাম, সেভেন হল
থ্রী প্লাস ফোরের 'সাম'।"
বলেই শিবু বাইরে গিয়ে
চুলকে নিলেন টাক
সিরাপ খেলেন ঘণ্টুবাবু
কুঁচকে গেল নাক।
ঘুম তবুও দেখায় কলা
উঠছে শুধু হাই।
ঘুম যেন কয়, "এই তো এলুম
এবার তবে যাই!"
রহস্যটা ভেদ হল তার
পরের পরের দিন
'তিন' নম্বর ঘুমের ওষুধ
'চার' করে ঘুমহীন।

ছবি অনুপ রায়

পেয়ে গেছি! জয় মা ভবানী!
তার মানে ঐ কানাতের নীচেই আছে ওদের মরণবাণ
গিরগিটির মতো সদাশিব এগিয়ে চলে কানাতের দিকে
মিঞা, এ-সময়ে এক পেয়ালা শিরাজি হলে কেমন হত?
শিরাজি মাথায় থাক। এক ভাঁড় তাড়ি পেলে বর্তে যেতাম, আগা।
ফাঁক বুঝে সদাশিব
কানাতের তলায় সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে

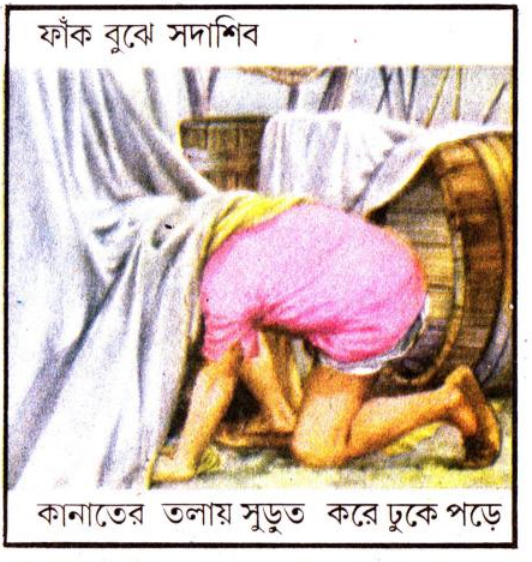

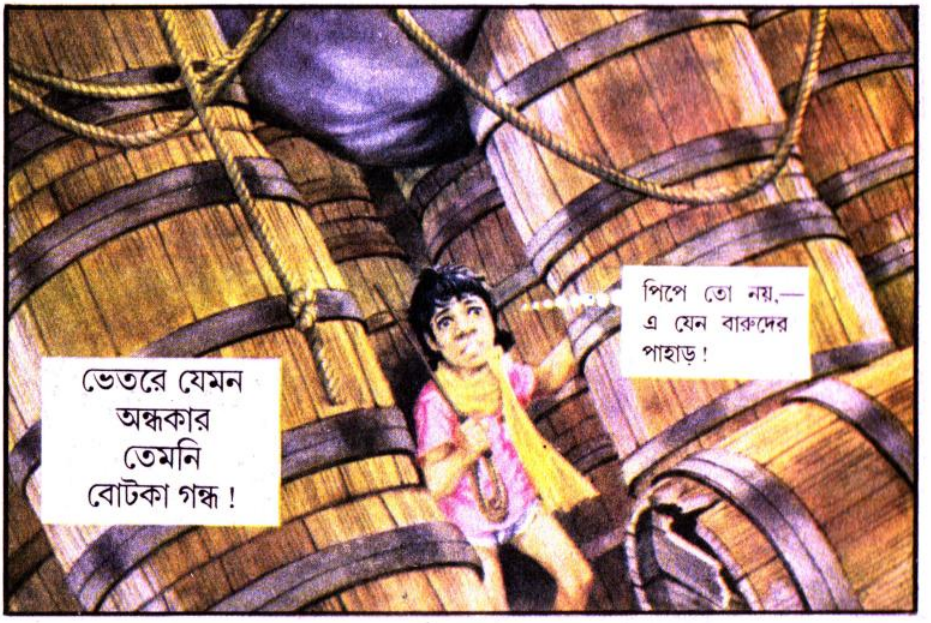

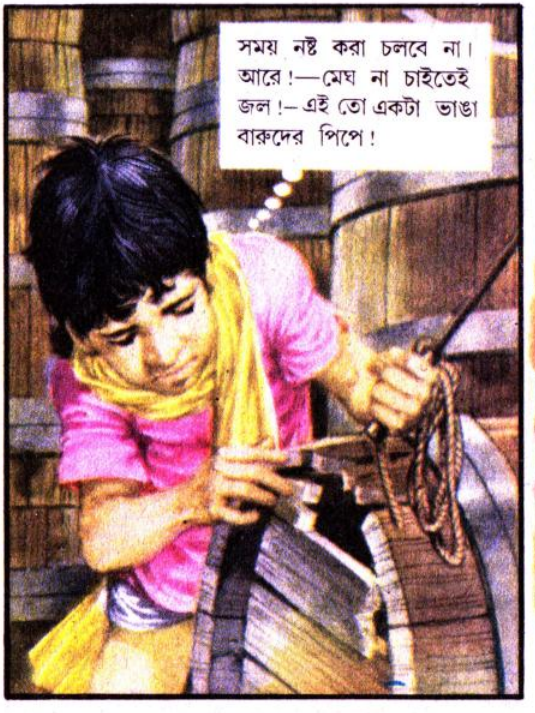

(এরপরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

জেলিফিশের আক্রমণে অস্ট্রেলিয়ায় রয় অসুস্থ। তাকে ছাড়াই টীম খেলছে। রয়কে সুস্থ করে তোলবার জন্য ঢিবি ভেঙেছে স্থানীয় একটি মানুষ। ব্যাপারটা কী?
বিল, ঢিবি থেকে ওগুলো কী বেরুচ্ছে?
উইপোকা! ঘাবড়ে যেও না!

এই লালা লাগালেই পা ঠিক হয়ে যাবে!
আ্যাঁ!

ওরেব্বাবা!
দেখাই যাক!
সত্যি ঠিক হয়ে যাবে তো?

রয়কে ছাড়াই খেলছে তার টীম। ফল ছিল ২—২।
তিন নম্বর গোল!
ঢুকে যা!
রোভার্স এখন এগিয়ে!

রোভার্স এখন স্বাভাবিক খেলা খেলছে...
হ্যাঁ, এর নাম খেলা!
আমাদের কেমন নাচাচ্ছে দ্যাখো!

আবার গোল!
শাবাশ, ডানকান!
৪—২

পাঁচ নম্বর গোল ব্ল্যাকির! তারপরেই ফাউল!
এ কী!
নিশ্চয় পেনালটি দেবে!
কিকটা নেবে কে!

চার্লি, তুমি কিক করো!
ধন্যবাদ!
গোলকীপারও গোল দিল!
সত্যি, দারুণ খেলছে সবাই!
কাকে খেলা বলে, দেখিয়ে দিল!
রোভার্স ৬—২ গোলে জিতল...
শাবাশ! শাবাশ!
কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা যাবে না!
তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে!
চটপট তৈরি হয়ে নিল রোভার্সের খেলোয়াড়রা...
যাক, রয়কে একটা সুখবর দিতে পারব!
আশা করি, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে!
ওরা যখন ফিরল, তখন অন্ধকার
রয় কেমন আছে, বিল?
ভাল তো?
স্বচক্ষে এসে দেখে যাও!
সেও খেলছে
অ্যাঁ!
২১—১৫। কী হে ডাক্তার?
ডাক্তার
রয় সব বুঝিয়ে বলল।
উইপোকার লালা লাগাতেই সেরে গেল?
তা হলে আর বলছি কী!
দারুণ ওষুধ!
সত্যি-সত্যি কোনও ডাক্তারকে তাহলে দেখাওনি?
দরকার কী? সারাটাই তো আসল কথা!
কে জানে, ফাইনাল-খেলায় হয়তো মাঠেও নামতে পারি!
আমার তো বিশ্বাস হয় না!
তুকতাকে আমার বিশ্বাস নেই!
এর পরে আগামী সংখ্যায়
রয় সত্যি খেলতে পারবে তো? নাকি সবটাই বুজরুকি?

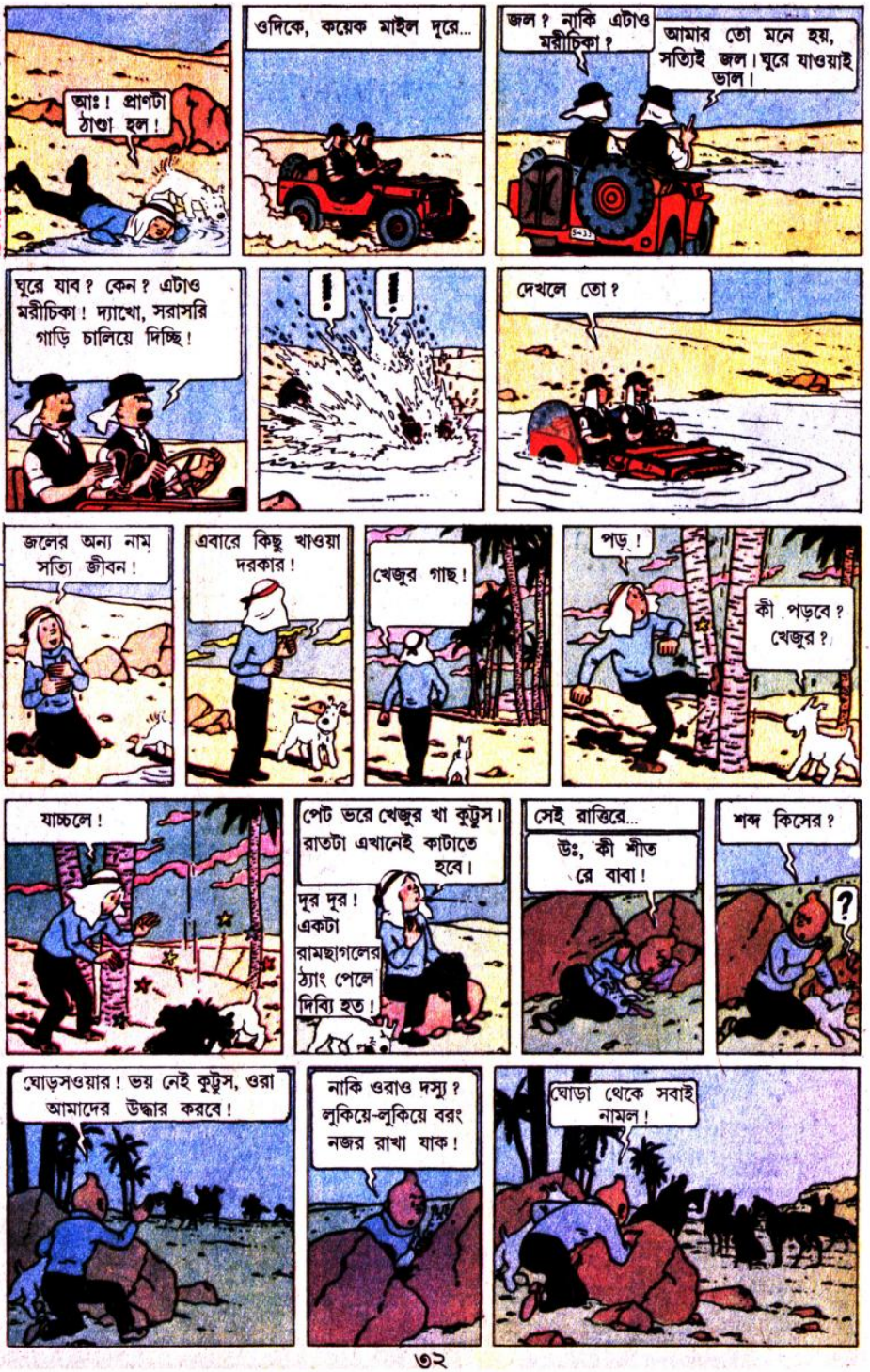
আঃ! প্রাণটা ঠাণ্ডা হল!
ওদিকে, কয়েক মাইল দূরে...
জল? নাকি এটাও মরীচিকা?
আমার তো মনে হয়, সত্যিই জল। ঘুরে যাওয়াই ভাল।
ঘুরে যাব? কেন? এটাও মরীচিকা! দ্যাখো, সরাসরি গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছি!
!
!
দেখলে তো?
জলের অন্য নাম সত্যি জীবন!
এবারে কিছু খাওয়া দরকার!
খেজুর গাছ!
পড়!
কী পড়বে? খেজুর?
যাচ্চলে!
পেট ভরে খেজুর খা কুট্টুস। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।
দূর দূর! একটা রামছাগলের ঠ্যাং পেলে দিব্যি হত!
সেই রাত্তিরে...
উঃ, কী শীত রে বাবা!
শব্দ কিসের?
?
ঘোড়সওয়ার! ভয় নেই কুট্টুস, ওরা আমাদের উদ্ধার করবে!
নাকি ওরাও দস্যু? লুকিয়ে-লুকিয়ে বরং নজর রাখা যাক!
ঘোড়া থেকে সবাই নামল!

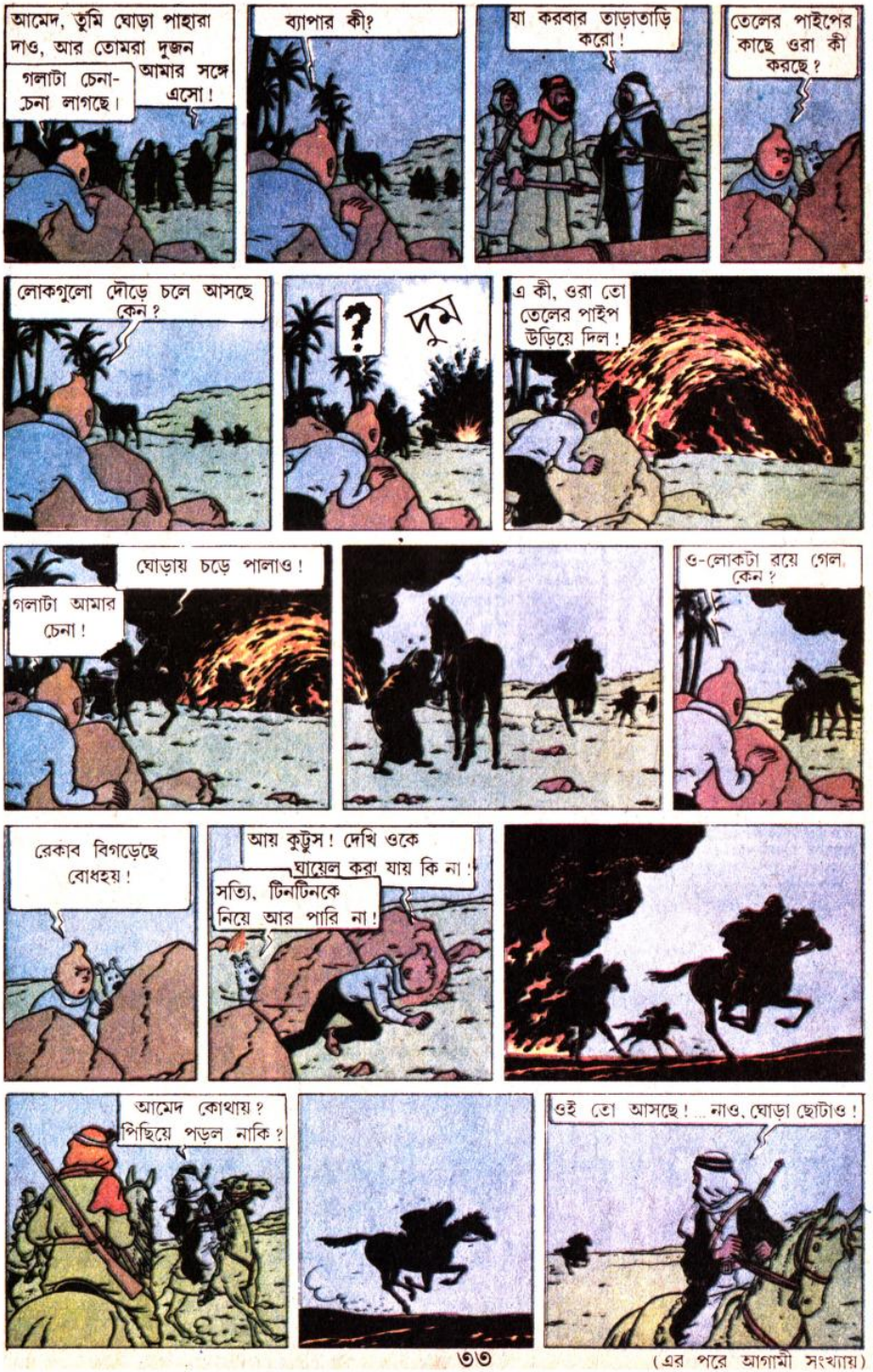

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
	■		■		■	
■	■	৬	৭		■	■
৮		■		■	৯	১০
	■	১১		১২	■	
১৩			■	১৪		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) শরতের ফুল। (৩) স্ফুলিঙ্গ। (৫) জলাশয়। (৬) নতুন শিক্ষার্থী। (৮) আদিম মানুষের আস্তানা। (৯) নিশাচর প্রাণী। (১১) ঘোরালেই মজা। (১৩) ক্ষমা। (১৪) সূর্য।

উপর-নীচ : (১) পালকি। (২) একটি ইয়োরোপীয় দেশের রাজধানী। (৩) শ্বাসযন্ত্র। (৪) মুকুট। (৭) কোন্ ছুটিতে শরীর জ্বালা করে ? (৮) কামান-বন্দুক নয়, কিন্তু গুলি ছুঁড়তে পারে। (১০) কাঁচায় সবজি, পাকলে ডাল। (১১) গালা। (১২) প্রাচীন মিশরের এক আশ্চর্য আবিষ্কার।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

সে	না	প	তি	■	থা	বা
তু	■	■	মি	■	■	লা
■	গা	■	■	■	হি	পো
মা	ন্ধা	তা	■	দ	ং	শ
ক	রী	■	■	■	সা	■
ড়	■	■	ঝা	■	■	দা
সা	জা	■	উ	ৎ	স	ব

ছোট্‌কার বন্ধুই ঘটনাটা বলছিলেন। ঘটনা না বলে, ধাঁধাও বলা যায় ব্যাপারটাকে। আর সেই কারণেই ছোট্‌কারও দেখলাম দারুণ কৌতূহল। ভদ্রলোক লোকগণনার কাজ করতেন একসময়, সেই আমলেরই অভিজ্ঞতা এটা। শুনতে মজা লাগে, তবে সমাধানটা তেমন সহজ নয়। একটু ভাবনাচিন্তা করতেই হয়। ভদ্রলোককেও করতে হয়েছিল। তা হোক। ভদ্রলোকের বলা সেই গল্পটা বা ধাঁধাটাই এবার তুলে দিচ্ছি সর্ব-প্রথমে। একটু ভেবেচিন্তেই না-হয় উত্তর বার করো।

প্রথম ধাঁধা॥ লোকগণনার কাজে এক অফিসার গিয়েছেন একটি বাড়িতে। বাড়ির নম্বরটি, অনেকের মতে, অশুভ। আর বাড়ির লোকজনের হিসেব মেলাতে গিয়ে যে-উত্তর পেলেন ভদ্রলোক, তা রীতিমত গোলমেলে বলে, আরও অশুভ ঠেকল তাঁর কাছে।

এক মহিলা অফিসার-ভদ্রলোককে জানালেন, "আমার তিন ছেলেমেয়ে। তাদের বয়সের যা যোগফল তা হল এ-বাড়ির নম্বর। বুঝলেন ?"

অফিসার-ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, বাড়ির নম্বর-প্লেটের দিকে আর-একবার চোখ বুলিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর বললেন, "কার কত বয়স ?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "সরাসরি বলব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, তাদের বয়সের গুণফল হল ছত্রিশ। এ থেকে বার করে নিন, কার কত বয়স।"

অফিসার-ভদ্রলোকটি একবার ভাবলেন বয়সের হিসেব বোধহয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু মনে-মনে অঙ্ক মেলাতে গিয়ে কোথায় যেন খটকা লাগল তাঁর। তিনি ভদ্রমহিলাকে বললেন, "আর-একটা প্রশ্ন করি। আচ্ছা, এদের মধ্যে বড়টি কী করে ?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ক্লাস ফোরে পড়ে আমার বড় মেয়ে। ছেলেরা ছোট।"

অফিসার-ভদ্রলোক বললেন, "ধন্যবাদ। আমি বয়সের হিসেব পেয়ে গেছি।"

বলো তো, কী করে বয়সের হিসেব পেলেন ভদ্রলোক, কী হিসেবই বা পেলেন ?

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ কলের মধ্যে উলটো করে বসানো রয়েছে আর-একটা কল, তবু জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী ?

তৃতীয় ধাঁধা॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

চনঅতয়লা

গতবারের উত্তর॥ (১) মনোরম। (২) Underground। (৩) ১০টি পাখি, ২০টি পশু।

—সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

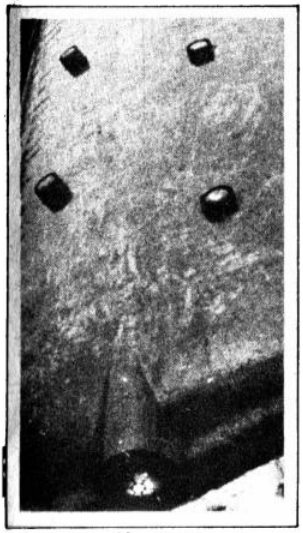

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল পুলিশের হেলমেটের ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ তোমার আর তোমার দাদার জন্যে দুটো উপহার আনা হয়েছে, তুমি কোন্‌টা নেবে?
উঃ দাদারটা।

প্রঃ যে-সব মহিলা লম্বা-লম্বা যোগ পটাপট করে ফেলতে পারেন তাঁদের কী বলা যায়?
উঃ যোগিনী।

প্রঃ এমন কোন কাজ আছে কি যা আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারেন?
উঃ আছে, আমি খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারি।

প্রঃ কোথায় ছারপোকা মারার অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যায়?
উঃ Bugমারিতে।

প্রঃ আপনি রক্ষণশীল না উদারপন্থী?
উঃ আমি উদারপন্থীদেরই খুব কাছা-কাছি— আমি উদরপন্থী।

প্রঃ বয়সের সঙ্গে শিশু যখন আকারপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে কী বলে?
উঃ বায়স। — **সুসেন**

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই সাতটি মাত্র দেশলাইকাঠি। নীচের ছবির মতো পরপর সেগুলোকে সাজিয়ে রাখো টেবিলের ওপর—

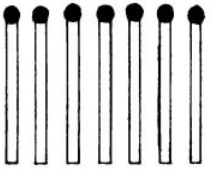

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, এই সাতটা কাঠি থেকে একটা মাত্র কাঠি এমনভাবে তুলে নিতে হবে যাতে টেবিলে কিছুই না পড়ে থাকে।

তোমার অদ্ভুত কথা শুনে বন্ধু নিশ্চিত চমকে যাবে। কিছুই পড়ে থাকবে না, এ আবার কেমনতর কথা। অন্তত ছটা কাঠি তো টেবিলে থাকবেই পড়ে। সে রেগেও যেতে পারে। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে হয়তো বলবে, 'এ কোনওমতেই সম্ভব নয়। আজেবাজে বকছ।'

বন্ধুর কথায় তুমি কিন্তু চটে যেয়ো না। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করো বরং। এবং বন্ধু যখন দারুণ উত্তেজিত, তখন তাকে নিজে করে দেখাও, কীভাবে ব্যাপারটা করা যায়।

কিছুই শক্ত কাজ নয়। একটা কাঠি হাতে তুলে নাও। আর বাকি ছটাকে নীচের ছবির মতন সাজিয়ে দাও—

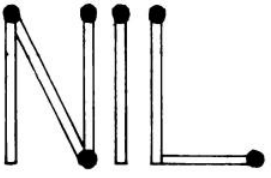

ইংরেজিতে 'NIL' মানে কী? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো। দেখবে কী মজাই না হয়!

— **মজারু**

হাসিখুশি

মাস্টারমশাই ছাত্রদের ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ভেনিজুয়েলা শহরটা কোথায় বলতে পারো?"

নিপু উঠে দাঁড়াল, "আধুনিক বিশ্বপরিচয় বইয়ের আশি পৃষ্ঠায় স্যার।"

জেলারসাহেব কয়েদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কোনো কষ্ট হচ্ছে?"

কয়েদি বলল, "একটাই কষ্ট, হুজুর। এখান থেকে বাইরে যাবার কোনো রাস্তা নেই।"

মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা তোমাকে কেন উকিল করতে চাইছেন, জানো?"

"জানি," চটপট জবাব দিল বুকুন, "বাবার যে কালো কোটটা ছোট হয়ে গেছে, সেটা পরতে পারব, তাই।"

ভৃত্য : বাবু, উঠুন। জাগুন।

গৃহকর্তা : (ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলে) কী রে, কী হল? এ-রকম চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

ভৃত্য : কাল রাত্রে আপনাকে ঘুমের ওষুধ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বাবু।

"শুনলুম আপনার ছোট ছেলে নির্মল নাকি মোটর-সাইকেল চালানোয় রেকর্ড করেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। মোটর-সাইকেল চালিয়ে ও প্রায় দশবার হাসপাতালে গেছে।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ভগবানের বিধান

(ইসরায়েলের লোককথা)

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জেরুজালেমের কাছে এক পল্লীতে থাকত আলহনান, আর তার বৌ দিনা। আলহনানের বন্ধকি ব্যাবসা, তাইতে সে অনেক টাকাকড়ি উপার্জন করেছিল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব ধর্মিষ্ঠ, কোনো অনুষ্ঠান তাদের বাদ যেত না। তা বাদে আলহনান তোরা পড়েছিল যত্ন করে। শাস্ত্রবাক্য তাদের সুমুখে ছিল প্রত্যক্ষ ভগবানের মতন।

এত সত্ত্বেও, ব্যাবসার ব্যাপারে কিন্তু আর কিছুরই কোনো দাম ছিল না তাদের কাছে। এমন-কী, নিরন্ন ভিখিরিও যদি চাইত এসে কিছু, দিনা মুখিয়ে উঠত, "রাখি-জিনিস দিয়ে যাও কিছু, নিয়ে যাও। এর মধ্যে আর কোনো কথা নেই।"

কাজেই আলহনানের সম্পদ দিন-দিনই বাড়তে লাগল।

একদিন সচম থেকে লোক এসেছে টাকা ধারতে, সুন্দর জিনিস এনেছে একটা জামানতি, যাচিয়ে দেখে আলহনান ভারী খুশি—"দিনা, চাবিটা নিয়ে যাও তো একবার ওপরে! ব্রোঞ্জের দেরাজে টাকা আছে—"

দেরাজ খুলে টাকা বের করতে যাবে দিনা, হঠাৎ দেরাজের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, "টাকা রেখে দাও! এ-টাকাও তোমাদের না, হিরেমুক্তো, এ-বাড়ির সোনা-রুপোর যত বাসনকোশন, এও তোমাদের না!"

আতঙ্কে হাত সরিয়ে নিয়ে দিনা দ্রুত পায়ে নেমে এল নীচে—"তুমি চলো শিগ্‌গির চলো—"

"কেন, কী হল!" বলে আলহনান উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে এল দিনা-র পেছনে।

নাও টাকা? যেই বাড়িয়েছে হাত, হঠাৎ দেরাজের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, "টাকা রেখে দাও! এ-টাকাও তোমাদের না, এ-বাড়ির হিরেমুক্তো সোনারুপোর যত বাসনকোশন, এও তোমাদের না!"

আতঙ্কে হাত সরিয়ে নিল আলহনান।

কার তা হলে এ-সব?

দেরাজের মধ্যে থেকে জবাব এল, "জেরুজালেমে জলপাই পাহাড়ের পাহাড়তলি গাঁয়ে থাকে কাঠের কারিগর আব্রাহাম, এ-সমস্ত তার।"

আলহনান চিন্তিত হয়ে পড়ল। যদি এ-সব

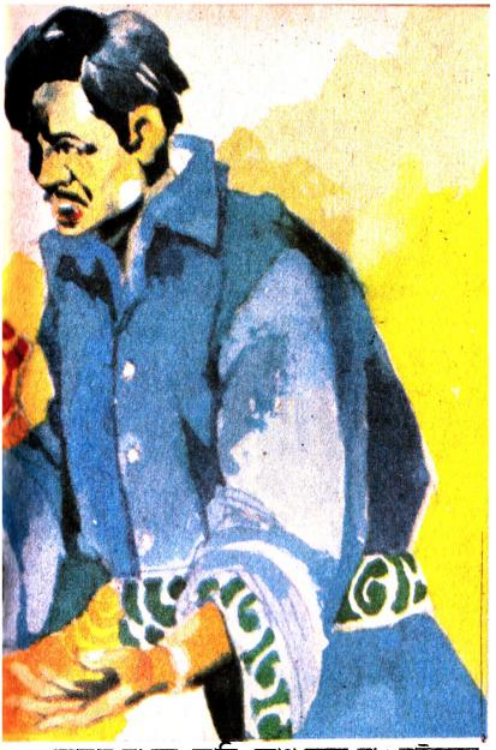

আমার না হয়, আমি ভোগ করব না। বাইবেলে স্পষ্ট আছে: ঘরের মধ্যে পাপ জমিয়ো না। দুজনে মিলে সেই রাতেই সোনারুপোর বাসনকোশন, হিরেমুক্তো যত ছিল বাড়িতে—সব দেরাজে ভরল। অন্ধকারের মধ্যেই টানতে টানতে নামিয়ে তাদেরই বাগানের জলপাই গাছটার ফাঁপা গুড়ির ভেতর পুরল সেই দেরাজ। তারপর কাঠকুঠো বালিমাটি ঠেসে গুঁড়িটা ভরাট করে দিল। থাক এইখানে। যদি আব্রাহামেরই হয় এ-সব, নিয়ে যাক সে এসে।

কয়েকদিনের মধ্যেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামল জেরুজালেমের পাহাড়ে—একটানা উপর্যুপরি বৃষ্টি—গাছপালা বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে চলল প্লাবনবেগে, তার মধ্যে আলহনানের জলপাই গাছটাও ভেসে গেল। ভেসে গিয়ে পড়ল সোরেক নদীর জলে।

সোরেক নদী মেছো নদী। এক জেলে মাছ ধরতে বসে দেখে মস্ত একটা গাছ ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে। ভাবল, এমন কাঠ যদি ভাল কারিগরের হাতে পড়ে তো সুন্দর সব জিনিস বানাতে পারে সে। ভেবে, গাছটা সে তুলল টেনে। জেরুজালেমের আব্রাহাম কাঠুরিয়ার কাছে নিয়ে গেলে ভাল দরও পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

ভেবে, পরদিন সে গাধার পিঠে মাছ বোঝাই দিয়ে জেরুজালেমে চলল বেচতে।

জেরুজালেমের লোকেদের মাছ বড় প্রিয়—শহরে ঢুকবে কি, তার আগেই মাছের বোঝা তার আদ্ধেক, আব্রাহাম ধরল তাকে সেই শহরতলিতেই—"দাও, শাবাতের দিনের জন্যে মাছ নিয়ে রাখি।"

তখন জেলে বলল, "কত্তা, ভাল দর পাই তো আস্ত একখানা জলপাই গাছের গুঁড়ি দিয়ে যাই!"

"বেশ! যদি পছন্দ হয়, খুশি করে দেব।"

কাঠ দেখে আব্রাহামের খুব পছন্দ। জেলেকে সে খুশিই করে দিল।

তারপর গুঁড়িটা নিয়ে চেরাই-কলে ফেলতেই গুঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সেই দেরাজ। পাল্লা খুলতেই হিরেমুক্তো, সোনারুপোর বাসনকোশন—কার এ-সব?

আব্রাহাম দেরাজ উলটে-পালটে, প্রতিটি বাসনকোশন উলটে-পালটে দেখে—যদি কারোর নাম খোদাই থাকে কোথাও। না, কারোর নাম নেই।

তা হলে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে।

আর কিছু না ভেবে আব্রাহাম তার কারবারটাকেই বাড়াতে বসল। আর, কিছুদিনের মধ্যেই জেরুজালেমের ধনী-মানী দশজনের মধ্যে তারও স্থান হয়ে গেল।

এদিকে আব্রাহামেরও সম্পদ বাড়ছে, আর আলহনানের কারবার হঠাৎ একেবারেই পড়তির। জমা পয়সায় হাত পড়ল, দেখতে-দেখতে তাও নিঃশেষ হয়ে এল। আলহনান হঠাৎ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। নিঃস্ব হলে পেটের জ্বালা তো যায় না। লুকিয়ে-লুকিয়ে দূর-দূর গাঁয়ে সে ভিক্ষেতেই বেরোতে শুরু করল, শুধু শুক্কুরবারে শাবাতের কালে ফিরে আসে আরো জীর্ণ হয়ে। একদিন ডাকল বৌকে—"দিনা, আর তো সয় না, চলো জেরুজালেমে গিয়ে দেখে আসি গে আমাদের সেই দেরাজটার কী দশা, সত্যি পৌঁছেছে কি না আব্রাহামের কাছে।"

মন করে বেরিয়ে পড়ল দুজন

জেরুজালেমে। ছেঁড়াখোঁড়া বেশ, দুই জাত ভিখিরি যেন আসছে সাফেদ থেকে কি আর কোথাও থেকে। সেদিনও শুক্রবার। আব্রাহাম কারিগরের ছেলের বিয়ে হবে পরের সপ্তাহে। সেই শাবাতের দিনে জেরুজালেমের সমস্ত বড়মানুষ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে আব্রাহামের বাড়ি। ভোজের টেবিলে ঝকমক করছে সেই যে দেরাজ থেকে পাওয়া সোনারুপোর সব বাসনকোশন।

বাইরে থেকে আলহনান আর দিনা উঁকি দিয়ে দেখে, ভোজের টেবিলে ঝকমক করছে দেরাজের সেই সব বাসনকোশন—তারা আর চোখের জল রাখতে পারল না।

আব্রাহামের বৌ বেরিয়েছিল ঘর থেকে। দেখে, এমন শুভ দিনে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে অচেনা দুটি মানুষ।—"কী হয়েছে তোমাদের?"

"না মা, কিছুই হয়নি।" বলে চোখের জল মুছে নিতে যায় দুজন একসঙ্গে, কিন্তু কিছুতেই মোছে না।

"না গো, তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে কিছু। আমার এমন শুভ দিনে অমঙ্গল কোরো না বাছা, বলো কী হয়েছে!"

পীড়াপীড়িতে মুখ খুলল আলহনান। এই তো ব্যাপার—সব বলল আদ্যোপান্ত। কী মহিমা ভগবানের! সব বাসন তেমনি ঝকমক করছে, প্রত্যেকটি বাসন।

আব্রাহামের বৌ বলল, "ও জিনিস আসলে যখন তোমাদেরই, তোমরা নিয়ে যাও। আমাদের অনেক আছে বাছা!"

"তা হয় না মা। ভগবান যদি চাইতেন, আমাদেরই তো থাকত সব! তা হলে কি এমন আদেশ হত? নিশ্চয় আমরা পাপী, এই শাস্তি তার।"

তবু পীড়াপীড়ি আমন্ত্রণে দুজনাকে ঢুকতে হল অভ্যাগত হয়ে। আনন্দ-উৎসব, এখানে বাইরে থেকে চোখের জল ফেলে চলে যাওয়া তো চলবে না!

শাবাত শেষ হয়ে যাবার পর আব্রাহামকে বলল তার বৌ, "ওরা তো কিছুই নেবে না। যা-ই দিতে যাই হাত উলটে ধরে। তা হলে অন্যরকমে খানিকটা পুরিয়ে দাও ওদের।"

বিরাট এক কেক বানাল আব্রাহামের বৌ—খোবানি-এলাচি-মধু সব মিশিয়ে, কেকের মধ্যে গোপনে-গোপনে ভরে দিল চারশো সোনার মোহর। তারপর ওরা চলে যাবার সময় নিয়ে গেল হাতে করে: "হাতে ধরে দিলেও তো কিছু তোমরা নেবে না বাছা, তা এই একটা কেক অন্তত নিয়ে যাও, পথে খেয়ো।"

একটা কেক—আদর করে দেওয়া—সে কি আর না বলা যায়! ঝোলায় ভরে আবার রাস্তায় নামল আলহনান আর দিনা।

নতুন শহরের সীমানা পেরোতে যেতেই ধরল এসে তাদের চুঙ্গি আদায়দার রাজপুরুষ কর্মচারী: "কর না দিয়ে যাচ্ছ যে বড়?"

"গরিব মানুষ বাবা, পয়সাকড়ি কিছু নেই।"

"চলো তা হলে জেলখানায়! কর না দিয়ে ঢুকেছ শহরে।"

হাতে-পায়ে ধরেও ছাড়ান নেই।

তখন মনে পড়ল, তাই তো কেকটা তো রয়েছে! ঝোলা থেকে বের করে বলল, "এই কেকটা নিয়ে ছেড়ে দাও বাবা। আর কিছু নেই আমাদের দ্যাখো।"

বিরাট কেক। দেখেই ভাল লাগে। না! ছাড়া যেতে পারে বটে এটার বদলে। কেকটা নিয়ে সীমানারক্ষী অফিসারের মনে হল, এ নিশ্চয় ভগবানের দান। এই যে ভাবছিলুম কদিন থেকে, কারিগর আব্রাহাম আমার পুরনো বন্ধু, নেমন্তন্ন করেছে ছেলের বিয়েতে—কী দেওয়া! এমন একটা কেক পেলে ওরা কী খুশি না হবে!

সিল্কের ফুলটুল বেঁধে লোক দিয়ে সেই কেক উপহার পাঠিয়ে দিল সে আব্রাহামের বাড়ি।

আর কেক হাতে নিয়ে আব্রাহাম আর তার বৌ আশ্চর্য, অপলক! মুখে কোনো কথা নেই। এই তবে বোধহয় ভগবানের বিধান! বলেছেন: 'সোনারুপো যা কিছু দ্যাখো, সব আমার। যে আমার চোখের দৃষ্টিতে করুণার আলো দেখতে পায়, তাকেই আমি সব দেব।'

দুঃখে-দারিদ্র্যে জীবনান্ত হল আলহনান আর দিনার। ধর্মিষ্ঠ দুই য়িহুদি স্বামী-স্ত্রী। তবু এত দুঃখ পেল তারা শুধু গরিব ভিখিরিদের দোর থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল বলে।

ছবি অনুপ রায়

মণির কথা

মণি দু'বছরে পা দিতে চলল। আর কিছুদিন পরেই ওর বয়স একটু বেড়ে যাবে। এখন মণি বেশ কথা বলা শিখেছে। আর সারাদিন কাজ-কর্মে ব্যস্ত। ওর কোনো সময় শুধু বসে বসে কাটে না। সদাই কাজ আর কাজ। অবশ্য পড়াশুনো যে করে না তা নয়। মাঝেমধ্যে পড়াশুনোও করে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মণি বেঞ্চের তলা থেকে বাবার একটা বই টেনে নেয়। তারপর পাতা উলটে যায় একের পর এক। অনেকক্ষণ এইভাবে চলে। শেষে বোধহয় ওর বিরক্তি ধরে যায়। তখন বই মেঝেতে পেতে তার ওপর সদাশিব হয়ে বসে থাকে।

দুপুরে আবার ঘুম থেকে উঠে একটু পড়া দরকার । অনেক বই টেবিলে থাকে। মণিবাবু চেয়ারে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। তারপর একটা বই খুলে পড়া শুরু করে দেয়।

'বোতালা-বোতালা' বলে সুর করে পড়ে। কী ভাষা, কী তার মানে—মণি ছাড়া আর কেউ জানে না।

এরপর কাজকর্ম। কাজের মধ্যে প্রথম কাজ প্যান্ট খুলে দলা পাকিয়ে বালতির জলে ভিজিয়ে ঘর মোছা। দিনের মধ্যে দু'তিনবার এই রকম কাজ চলে।

আরও আছে, দমকলের যন্ত্রপাতি। সেই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে সারাক্ষণ দমকল বা সাইকেল সারাই চলে। কেউ বিরক্ত করলে যন্ত্র দিয়ে তাকে এক ঘা বসিয়ে দেয়। কাজের সময় বিরক্ত করলে চলে! কাজের সময় বিরক্ত করলে কে না রাগ করে বলো?

কঙ্কাবতী সরকার (বয়স ১৬)

শোনা কথা

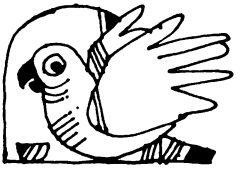

বহুদিন থেকে আমার টিয়াপাখি পোষার শখ। আমি মাকে বললাম, "পাখির দেখাশোনার সব ভার আমি নেব।" বাবা একটি টিয়া কিনে দিলেন।

তার গায়ের রঙ কচি ঘাসের মতো আর ঠোঁটটা রক্তের মতো রাঙা। ওকে আমি রোজ খাবার দিই, জল দিই। ও কাঁচা লঙ্কা খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু আমি ওকে কথা বলতে শেখাইনি।

রোজ সকালে আমার ঠাকুমা আমাকে ডেকে বলেন, "ও বাবু ওঠ, ছটা বেজে গেল।" আমি উঠে মুখ-হাত ধুয়ে পড়তে বসি।

একদিন আমরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। তারপর রাত একটার সময় শুতে গেলাম।

হঠাৎ সকালে কার ডাকে যেন ঘুম ভেঙে গেল। একটু পরে বুঝতে পারলাম, টিয়াপাখিটা খাঁচার মধ্যে বসে অবিকল ঠাকুমার গলায় বলছে, "ও বাবু ওঠ, ছটা বেজে গেল।"

সেদিন আমি জানলাম, টিয়াপাখিকে কথা না শেখালেও ওরা শুনে-শুনে অনেক কথা শিখে যায়।

সঞ্জয় রায় (বয়স ১০)

রেলগাড়ি যায়

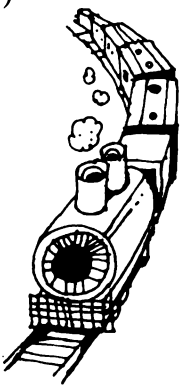

হুস্ হুস্ ধক্ ধক্
ধোঁয়া ওড়ে ভক্ ভক্
লোহার চাকায়
রেলগাড়ি যায়।
খুব বড় মোটা-সোটা,
লোহার দানব ওটা
কাজ তার খালি ছোটা
হেথায় হোথায়।

সুদীপ ঘোষ (বয়স ৯)

বাঘের মাসি

ওগো বাঘের মাসি
কবে যাবে কাশী?
কুকুরকে নাও সাথে
পথ দেখাবে রাতে।

জয়দীপ লাহিড়ী (বয়স ৮)

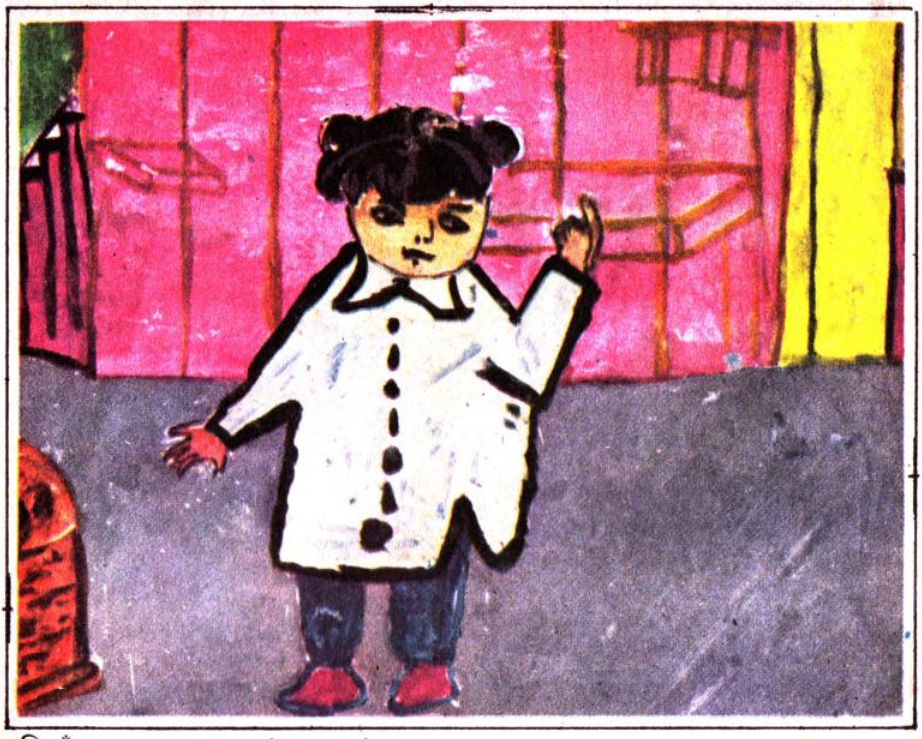

ছবি এঁকেছে : রানা গুপ্ত (বয়স ১০)

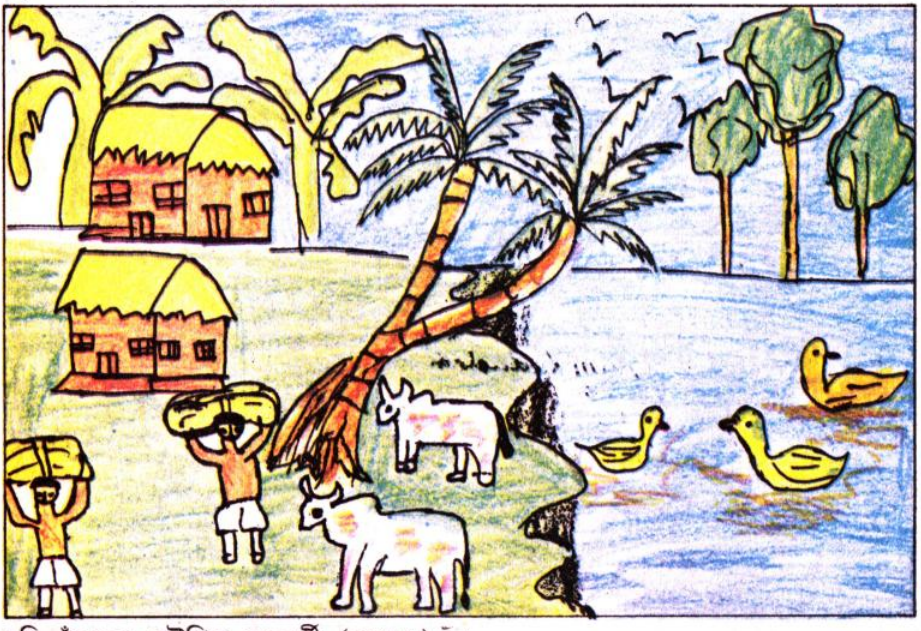

ছবি এঁকেছে : কৌশিক চক্রবর্তী (বয়স ৯)

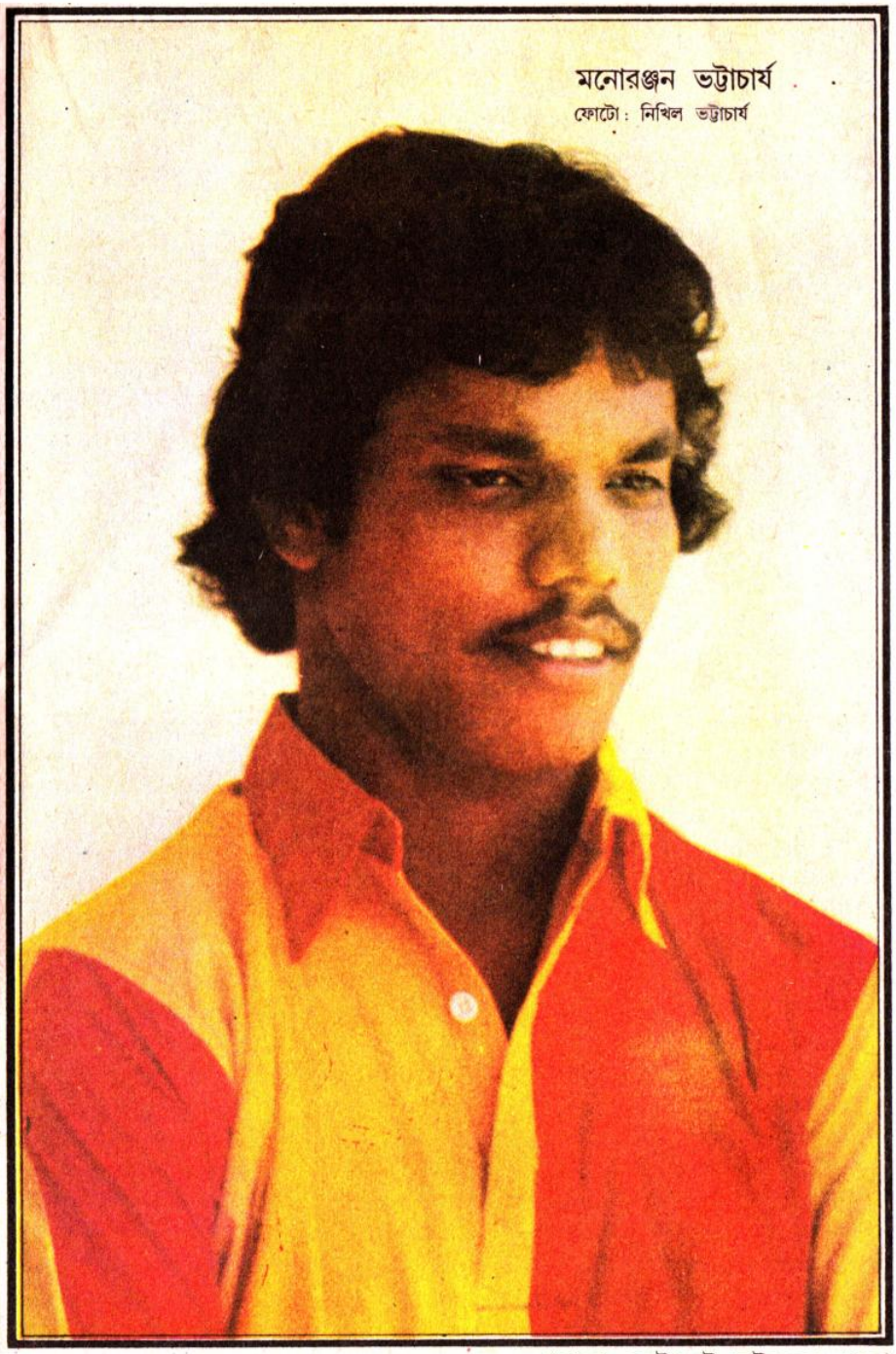

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই ফুটবলের খবর)

শান্ত এখন অশান্ত

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

নভেম্বরের শুরু। শীতের মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে হাঙ্গারি থেকে পোল্যাণ্ড ছুটছে একখানি দ্রুতগামী ট্রেন। এক ভারতীয় যুবক সেই ট্রেনের অন্যতম যাত্রী। ইউরোপের শীত যে কী সস্তু তা টের পাচ্ছিলেন তিনি। পোশাক কেন, হাড় ভেদ করে ঢুকছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তিনি ভাবছিলেন, ভাগ্যের বিচিত্র বিধানে তাঁকে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। খুলে দিলেন যুবকটি। পুলিশ!

কী ব্যাপার? কাগজপত্র সব দেখাতে হবে। দেখানো হল পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি। পোল্যাণ্ড যাচ্ছেন, ভাল কথা। কিন্তু আপনার চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিসা কোথায়? আপনি তো এখনও চেক সীমান্ত পার হননি!

চেক ভিসা? নেই। তা ছাড়া, ওটা তো আমার লাগবার কথা নয়।

নিশ্চয়ই লাগবে। আপনাকে আর যেতে দিতে পারব না। নামুন।

নেমে যেতে হবে? সেই হিমেল মাঝরাতে ভিন দেশের অজানা স্টেশনে ভাষাগত অসুবিধা নিয়ে (উপরের কথোপকথনও সহজে হয়নি) এখন তিনি কী করবেন? যুবকটির চোখ ফেটে জল এল। স্ত্রী ও শিশুকন্যাটির কথা মনে পড়ল। কী কুক্ষণেই না উন্নত মানের ফুটবল কোচিং শিখবেন বলে দেশ ছেড়েছিলেন। স্থির করলেন, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এখনই বুদাপেস্তে ফিরে যাই। সেখান থেকে সোজা ঘরের ছেলে ঘরে। বাঙালির ছেলের অত শখ ভাল নয়।

হ্যাঁ, ভোরের ট্রেন ধরে শান্ত মিত্র বুদাপেস্তে তাঁর পরিচিত স্বদেশীয়ের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই স্টেশনের সহৃদয় স্টেশন-মাস্টারের কথা কোনও দিনই তিনি ভুলবেন না। কিন্তু তিনি তখনই দেশে ফিরে আসেননি। পরে পোল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৯ সালে যখন শান্ত প্রায় ছ'মাস ধরে ইউরোপে ফুটবল-প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করছিলেন। তখনও শান্ত জানতেন না, যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর প্রকৃত পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা, সেই প্রিয় ক্লাবটির প্রশিক্ষণের ভারও একদিন তাঁকেই নিতে হবে।

শান্তজ্যোতি মিত্রর জন্ম (৭ জানুয়ারি ১৯৪৪) কলকাতার ঢাকুরিয়াতে। স্বর্গত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ছেলেকে ফুটবলে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। উয়াড়িই শান্তর প্রথম ক্লাব। চার বছর সেখানে কাটিয়ে যখন ১৯৬২-তে বি এন আর-এ যান তখনই ডীপ ডিফেণ্ডার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের প্রতি তাঁর কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ! তাই ১৯৬৫-তে ইস্টবেঙ্গলে গেলেন। এর আগে অবশ্য ভিয়েতনামে ভারতীয় যুবদলের, বি সি রায় ট্রফিতে জুনিয়ার বাংলার এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্ব করা হয়ে গেছে। টানা আট বছর ইস্টবেঙ্গলে খেললেন। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালে বাংলার অধিনায়ক। সেবার ছ'বছর পর সন্তোষ ট্রফি বাংলায় এল। পরের বার ইস্টবেঙ্গলের সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষ। ঐ স্মরণীয় বছরে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক তিনিই। খেলেছেন প্রচুর বিদেশী দল — হাঙ্গারি, রাশিয়া, বুলগারিয়া, মালয়েশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার নানা দলের — বিপক্ষে। মাঝে-মাঝে অধিনায়কত্বও করেছেন।

কিন্তু ওসব তো খেলোয়াড় শান্ত মিত্রের পরিচয়। তার সঙ্গে কোচ শান্তর সংযোগ কতটা? ওঁর নিজের কথাতেই বলি—ভাল কোচ খেলোয়াড় হিসেবে ভাল না-ও হতে পারে। কিন্তু ভাল খেলোয়াড় ভাল কোচে পরিণত হতে পারে, অবশ্য যদি আগ্রহ ও চেষ্টা থাকে।

কোচিং নিয়ে শান্তর আগ্রহ অনেক দিনের। কিন্তু ১৯৭২ সালে স্টেট ব্যাঙ্কে দায়িত্বপূর্ণ পদ পাবার পর কিছুদিন তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বছর-দুয়েক বাদে অল্পস্বল্প ধারাভাষ্য দিতে শুরু

করলেন বেতারে। ওতে একটু সুযোগ পাওয়া গেল মৌখিক কোচিংয়ের। অবশ্য প্রদীপদা অনুপস্থিত থাকলে ইস্টবেঙ্গলের দলটিকে নাড়াচাড়া করার কাজটি শান্তরই ছিল। এইরকম অবস্থায় ১৯৭৭ সালে জর্জ টেলিগ্রাফের আমন্ত্রণ পেলেন। জর্জের কোচ তখন স্বনামধন্য ল্যাংচা মিত্র। অনেকের মতো শান্তরও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু সেবার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে জর্জকে ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। লীগের প্রথম তিনটি ম্যাচেই জর্জের হার হয়। তখন ল্যাংচা মিত্র সরে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত সিংহ ও অন্য অনেক বন্ধুবান্ধব শান্তকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন জর্জের ভার নেবার জন্যে। ল্যাংচা মিত্র নিজেও লিখলেন শান্তকে। তখন শান্তর আর কোনও দ্বিধা রইল না।

সেবার লীগে জর্জ টেলিগ্রাফ পঞ্চম স্থান পেয়েছিল। মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র (পরে সেবারই মোহনবাগান ত্রিমুকুট পায়) ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের কাছে লড়াই করে হার। পরের বার লীগে চতুর্থস্থান। আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেল জর্জ দার্জিলিংয়ের গোল্ড কাপ জিতল। ডুরাণ্ডে ভাল খেলল।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তর উৎসাহ ও সাহসও বাড়ল। সিদ্ধান্ত নিলেন, বিদেশে যেতেই হবে। জার্মানি, হাঙ্গারি প্রভৃতি জায়গায় চিঠি লিখতে শুরু করলেন। পরের বছরের (১৯৭৯) শুরুতে একবার দেখেই আসা যাক কীভাবে ওরা বিশ্বমানে পৌঁছয়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ছাব্বিশে জুলাই অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন শান্ত। বাইরে যে ছোটখাটো অসুবিধা বা বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়নি তা নয়। তবে সব-কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি নিজের সংকল্পে অটল ছিলেন—শিখে ফিরব।

"কিন্তু ১৯৮১ মরসুমের মাঝখানে প্রবীর মজুমদারকে সরিয়ে আপনাকে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব দেওয়া হল, এতে রাজি হওয়াটা আপনার উচিত হয়েছে কি?"

ঘণ্টা দুয়েক ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের তালিম দিয়ে পরিশ্রান্ত শান্ত আমার প্রশ্নে একটুও বিরক্ত হলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে

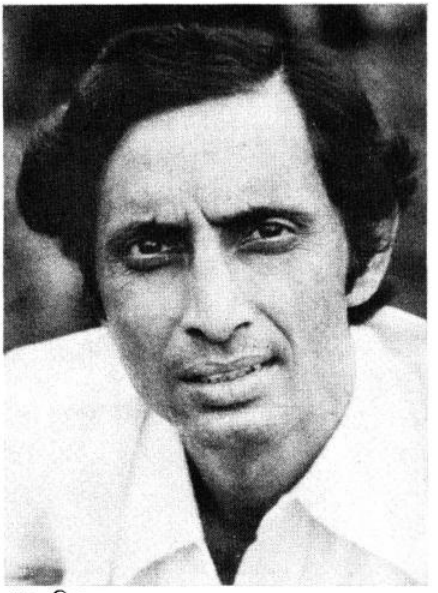

শান্ত মিত্র

রইলেন। পরে আস্তে-আস্তে বললেন, "দেখুন আমার ভাগ্যটাই বোধ হয় এইরকম। ঘটনাচক্রে এমন হয়ে যায়, আমাকে মাঝখানেই আসতে হয়। সেবার ল্যাংচা। এবার প্রিয় বন্ধু প্রবীর। একসঙ্গে খেলেছি ইস্টবেঙ্গলে। প্রবীরের দুর্ভাগ্য, টীম ভাল খেলতে পারল না ফেডারেশন কাপে। ওর জায়গায় যখন আমাকে নেওয়ার প্রস্তাব আসে, তখন দারুণ দ্বিধায় পড়ি। পুরো এক সপ্তাহ চিন্তা করে আট দিনের দিন সম্মতি জানাই। জানেনই তো, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ব্যাপার হলে 'না' বলতে পারি না। প্রবীর আমায় ভুল বোঝেনি; ওর সঙ্গে কথা বলে তবেই এই দায়িত্ব নিয়েছি।"

ইস্টবেঙ্গল দলকে ফেডারেশন কাপের বিপর্যয়ের পর কীভাবে দাঁড় করাবেন শান্ত? বললেন, "খুব সন্তর্পণে এগোতে চাইছি। —কি অনুশীলন কি টীম তৈরি—সব ব্যাপারেই। সব সময় নজর রাখছি যাতে অতি-অনুশীলন বা অল্প-অনুশীলন না হয়ে যায়। দল গড়ার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে। চারজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের হাঁটুতে আঘাত আছে (মজিদ, জামশিদ, অমলরাজ, সুধীর), অথচ বেশি বাড়তি খেলোয়াড় নেই। পুরো দলটাকে হাতে পাইনি। যাদের পেয়েছি তাদের কারও-কারও

শারীরিক সক্ষমতার অভাব। এই অবস্থায় আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। আমি খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জাগাতে চাইছি—তোমরা একটা সেরা দলের সেরা খেলোয়াড়। এমনভাবে খেলো যাতে সভ্য-সমর্থক সকলেই খুশি হয়।"

অবশ্য এই ধরনের দায়িত্ববোধ শান্ত মিত্র সভ্য-সমর্থকদের কাছ থেকেও আশা করছেন। তিনি চান, সবাই সমস্যাগুলি বুঝুন। বা অন্তত বোঝবার চেষ্টা করুন। প্রসঙ্গত শান্ত বললেন, দলকে সমর্থনের অজুহাতে মাঠে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনার জঘন্য অপচেষ্টাকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।

"আপনার টীমে তিন ইরানি আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড় রয়েছে। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ভাষার বাধা দেখা দেবে না?"

শান্ত ইউরোপের ফুটবল-ইতিহাসে অনন্য রেকর্ড-সৃষ্টিকারী রিয়াল মাদ্রিদের কথা তুললেন। "পুসকাস, ডি স্টেফানো, কোপা, জেন্টো, রিয়াল, ম্যাতিয়স, দেল সল — এঁদের তো নানা ভাষা নানা মত ছিল। কিন্তু খেলার গুণে এঁরা ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে স্বপ্নের ফুটবল খেলেছিলেন। ওঁদের ফুটবলটাই ভাষা ছিল। অবশ্য ওসব খেলোয়াড়ের কথাই আলাদা। আমার ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা যে একেবারে দেখা দিচ্ছে না, তা নয়। বিশেষত, আধুনিক প্রশিক্ষণে এত জটিলতা, এত খুঁটিনাটি আছে যে সেগুলো বিদেশী ভাষায় শেখা শক্ত। তবুও মনে হয় বড় রকমের অসুবিধার মুখোমুখি আমাকে হতে হবে না।"

শান্তর মতে আদর্শ ছক বলে কিছুই নেই। সবটাই নির্ভর করে খেলোয়াড়দের গুণের উপর। ওরাই ওদের নিজেদের উপযুক্ত 'সিস্টেম' তৈরি করে নিতে পারবে। তবু প্রশ্ন করলাম, "ইস্টবেঙ্গলে তিনজন ভাল লিংকম্যান রয়েছে, প্রয়োজনবোধে ওদের তিনজনকেই কাজে লাগিয়ে ৪-৩-৩ প্রথায় খেলবেন কি?" শান্ত জানালেন, সে-চিন্তা তিনি করেছেন।

বিদেশের অভিজ্ঞতার সম্পদ শান্ত ইস্টবেঙ্গলে উজাড় করে ঢেলে দেবেন। কিন্তু এখনই নয়। এখন বড়-বড় চিন্তা করার সময় ও সুযোগ নেই। অবস্থাটা অন্যরকম। আগে

বলতে পারো?

ছবি - পরাগ রায় / ১৫ বছর

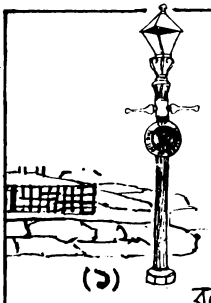

(১)

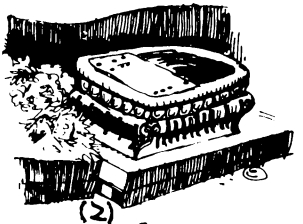

(২)

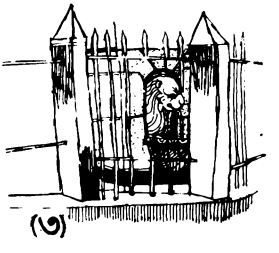

(৩)

বলতো ওপরের ছবিগুলি কিসের?

(১) স্ট্রীটল্যাম্প বা রাস্তার ধারের বাতিদান। বিজলী আলো আসবার আগের যুগের।

(২) গরু ঘোড়ার জলখাবার লোহার টব। রাস্তার ধারে ধারে এখনো চোখে পড়ে। পথশ্রান্ত গরুঘোড়া গাড়ি টানতে টানতে তৃষ্ণার্ত হলে যে জল পান করতো।

(৩) ভিস্তি বা ভারীরা একটা জলাধারে জল ঢেলে দিতো। আর সেই জল সিংহের মুখ দিয়ে পড়তো। তখনকার দিনে তো আর জল সরবরাহের জন্য নল ও কলের ব্যবস্থা ছিল না।

পথ চলতে চলতে আজও কলকাতার রাস্তায় এরকম-অনেক পুরানো দিনের দরকারী জিনিষ চোখে পড়বে। তোমরা যদি সত্যি সত্যি আগ্রহী হও তাহলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়ামে বা মল্লিক বাড়ীতে গিয়ে আরও অনেক কিছু দেখে আসতে পারো।
এগুলো কেন সংগ্রহ করা হয় জান? অতীতের ইতিহাসের নিদর্শন রাখবার জন্য। তোমাদেরও যদি এমন কোন জিনিষ থাকে বা চোখে পড়ে, তবে তা যত্ন করো। যেন নষ্ট না হয়।

জনসংযোগ বিভাগ, সি.এম.ডি.এ, ৬-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত

দলটাকে দাঁড় করাতে হবে। সময় সুযোগ এলে নিশ্চয়ই বাইরের অভিজ্ঞতাকে তিনি ইস্টবেঙ্গলের কাজে লাগাবেন। আপাতত শুধু রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগের লীডারের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ও মজিদকে তৈরি করতে চান শান্ত। এই বিদেশী কায়দা ছাড়া আর কোনও কিছু নেওয়ার কথা এখন তিনি ভাবছেন না।

শান্ত মিত্রের প্রিয় কোচ 'বাঘা' সোম। বললেন, "উনি সবাইয়ের গুরু।" রহিমও ওঁর প্রিয়, তবে রহিমের কাছে শেখবার সুযোগ শান্ত পেয়েও পাননি। যোগাযোগ হবার অল্পদিন পরেই রহিম মারা যান। আর খেলোয়াড় চেনার ব্যাপারে ভারতে অদ্বিতীয় জে. সি. গুহ। বিদেশে যে-সব কোচের সংস্পর্শে শান্ত এসেছেন তার মধ্যে ওঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছেন বুদাপেস্তের এম টি কে দলের উরি মেজোয়ি।

শান্ত মনে করেন কোচিংকে পুরো সময়ের কাজ হিসেবে না নিলে চলে না। কেবল একজন সম্পূর্ণ পেশাদার কোচই সফল হতে পারেন। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের বায়ো-ডাটা কোচের নখদর্পণে রাখতে হয়। কে কী পছন্দ বা অপছন্দ করে, কার প্রবণতা কোন্‌দিকে—সবই হিসেব রাখতে হয় বিদেশের কোচকে। কোচ তাই সদাব্যস্ত। উপরে যে মেজোয়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী আক্ষেপ করে শান্তকে বলেছিলেন, "মিত্র, ইচ্ছে থাকলেও একদিন তোমাকে নেমন্তন্ন করে ডিনার খাওয়াতে পারলাম না, কারণ আমি যে একজন কোচের স্ত্রী!"

শান্ত সবিনয়ে জানালেন, "কোচ হিসেবে এখনও কিছু হইনি। অনেক কিছুই শেখার রয়েছে, জানার রয়েছে এখনও।" কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে কিছু ট্রফি জেতানোর প্রসঙ্গ তুললেই শান্ত ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। বলেন, "এখন কিছু বলব না।"

না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, শান্ত সেইদিনই শান্ত হবেন যেদিন তাঁর পরিচালনায় ইস্টবেঙ্গল ট্রফি জিতবে। ওটা তাঁর অঙ্গীকার। নিজের কাছে। সেই দিন কি ১৯৮১-৮২'র মরসুমেই আসবে?

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ইওরোপের সেরা ফুটবল

আশিস রায়

প্যারিসের সবুজ-ঘাসে-ঢাকা মাঠে ইংলণ্ডের লিভারপুল দল স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদকে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বার ইওরোপীয়ান কাপ ঘরে তুলল। ইওরোপীয়ান কাপের প্রতিযোগিতা হয় নক-আউট পদ্ধতিতে—ইওরোপের প্রতিটি দেশের প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে। এছাড়া যারা চলতি ইওরোপীয়ান কাপ জেতে তারা পরের বছর সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার যোগ্যতা লাভ করে। গত পাঁচ বছরে লিভারপুল দল চারবারই মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সম্মান অর্জন করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত পাঁচ বছরে লিভারপুল দল যেমন তিনবার ইওরোপীয়ান কাপ জয় করেছিল, বাদবাকি দুবারও জিতেছিল ইংলণ্ডেরই আর-একটি দল—নটিংহ্যাম ফরেস্ট। প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের উত্তেজনা সব দেশেই সমান। ফলে লীগ চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা স্বভাবতই ইওরোপের ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। সেই জন্যই একে বলা হয় ইওরোপের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। খেলার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিযোগী ক্লাবকে স্বদেশের মাঠে একবার এবং প্রতিপক্ষের মাঠে আরেকবার—এই দুই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দুটি খেলার গড়পড়তা ফলাফলই বলে দেবে সে ক্লাব পরের রাউণ্ডে খেলতে পারবে কি না।

মূল খেলাগুলোর পর এবারের সেমিফাইনালে ওঠে পশ্চিম জার্মানির বেয়ার্ন-মিউনিখ, ইতালির ইণ্টার-মিলান, ইংলণ্ডের লিভারপুল ও স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ দল। এরা প্রত্যেকেই ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব, সুতরাং ফাইনালে কারা উঠবে তা নিয়ে বেশ জল্পনা চলেছিল। শেষ পর্যন্ত

বেয়ার্ন মিউনিখ গড়পড়তা এক গোলের ব্যবধানে হেরে যায়, আর রিয়াল-মাদ্রিদ ইন্টার-মিলানকে হারায় গড়পড়তা ২-১ গোলের ব্যবধানে। ফলে এক রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল খেলার নিষ্পত্তি করতে হয় নিরপেক্ষ কোনো দেশের মাঠে একটি মাত্র খেলার মাধ্যমে। এবারে সে-দেশটি ছিল ফ্রান্স।

তবে ইওরোপের বিখ্যাত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খুব উঁচু মানের ফুটবল উপহার দিতে পারেনি। খেলার প্রথমদিকে শীর্ষ প্রতিযোগিতার কিছুটা চাঞ্চল্য ও চমক অবশ্য চোখে পড়ে। প্রথম বিশ মিনিট লিভারপুল দুর্দমনীয় আক্রমণ চালায়, যার ফলে তাদের গোলকীপার রে ক্লেমেন্সকে একবারও বল ছুঁতে হয়নি। তারপর রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যমাঠের দক্ষ খেলোয়াড় হুয়ানিটো হঠাৎ জ্বলে ওঠেন এবং সহ-খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেন। তিনি দু-বার গোলের সহজ সুযোগ তৈরি করে দেন, আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সে-সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। পালটা আক্রমণে লিভারপুল দলের স্যানেস রিয়াল মাদ্রিদের গোলে বিপজ্জনক এক শট নেন, কিন্তু গোলকীপার অগাস্টিন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা ফিরিয়ে দেন। লিভারপুলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ডাগলিস সামান্য আহত থাকায় দলের বেশির ভাগ দায়িত্ব এসে পড়ে স্যানেসের ওপর। রিয়াল-মাদ্রিদের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় টিলাইক সেদিন তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। হুয়ানিটোর ক্রীড়া-নৈপুণ্যই সেদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটা ঢিলেঢালা এবং ঘর-সামলানো গোছের হয়ে পড়ে। লিভারপুল দলের রে কেনেডি একটি থ্রো করেন খেলার ৮৩ মিনিটের সময়। রিয়াল-মাদ্রিদের ফুল-ব্যাক কর্টেজ বলটি বুঝতে ভুল করে নিয়ন্ত্রণ হারান। বল চলে যায় রিয়াল-মাদ্রিদের পেনালটি সীমানার দিকে। আর সেই সময় অ্যালেন কেনেডি ওভারল্যাপ করে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিক থেকে প্রচণ্ড শটে খেলার একমাত্র গোলটি করেন।

অ্যালেন কেনেডি

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, সে-ই কি কাশিমের চরের খুনের মামলার ফেরারি আসামি গোবিন্দ মাস্টার ? পরিচয় জানতে গোপনে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। সকালে তাঁবুতে এসে গবা জানায়, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" পাখিকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে রামু তার ঠোঁটের ঠোক্কর খায়। বাবাও তাকে বেত মেরেছেন। রামু ইতিমধ্যে গবার মাধ্যমে ছদ্মবেশী গোবিন্দের সন্ধান পায়। গবা বলে, কাশিমের চরে খুন হবার সময় হরিহর পাড়ুই বলেছিল, "পাখি সব জানে।" খড়ের গাদায় আগুন লাগা সত্ত্বেও গোবিন্দ বেঁচে যায়। তারপর·

॥ ১৭ ॥

উদ্ধববাবু ঠিক করলেন আজকের রাতটা জেগে পাহারা দেবেন। বাড়ির লোকেরা খুব-একটা রাত জাগতে আগ্রহী নয়। চাকরবাকরেরা দায়ে পড়ে জাগবে বটে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস নেই। উদ্ধববাবু একাই জাগবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দুজন সঙ্গী জুটে গেল। একজন তাঁর ছোট ছেলে রামু। বাচ্চাদের রাত জাগা উদ্ধববাবু পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু রামুটা বেশ ডাকাবুকো আছে, গুলতির হাতটাও বেশ পাকা। লেখাপড়ায় বুদ্ধি না খুললেও অন্যান্য ব্যাপারে যে রামুর বুদ্ধি খুব চটজলদি খেলে তা উদ্ধব জানেন। কাজেই রামু যখন বাবার সঙ্গে পাহারা দেওয়ার প্রস্তাব করল তখন তিনি খুব-একটা আপত্তি করলেন না। কটমট করে ছেলের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, "ফুলহাতা সোয়েটার পরে, মাথায় কানে বেশ করে কমফর্টার জড়িয়ে নেবে। পায়ে জুতো মোজা থাকে যেন।" দ্বিতীয় সঙ্গী জুটল নব্বই বছরের জাফর মিঞা। বয়স নব্বই হলেও জাফর মিঞার শরীরটি মেদহীন, দীর্ঘ এবং খুবই কর্মক্ষম। তিনি সামান্য দুধ আর ফল ছাড়া অন্য কোনো খাবার খান না। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন। তাঁর মাথাটি ঠাণ্ডা, মেজাজটি ঠাণ্ডা, মুখে সর্বদা হাসি। তবে জাফর মিঞা কানে কম শোনেন। উদ্ধববাবুকে সেই ছোট অবস্থা থেকে দেখে আসছেন। সেই উদ্ধববাবু বাড়ি ডাকাত পড়বে শুনে তিনি নিজেই যেচে একটা লাঠি হাতে চলে এলেন। গলা কান মাথা ঢাকা বাঁদুরে টুপি, মোটা কম্বল আর নাগরা জুতোয় তাঁকে বেশ জম্পেশ দেখাচ্ছিল।

উদ্ধববাবু নিজেও সঙ্গে একটা অস্ত্র রাখলেন। বহুকাল আগে তাঁর এক রাজপুত মক্কেল মামলায় জিতে একটা তরোয়াল উপহার দিয়েছিল। বংশের স্মৃতিচিহ্ন। তরোয়ালটা বেশ লম্বা আর ভারী। রাজপুত বলেছিল, 'এই তলোয়ার যদি খাপ থেকে কখনো বের করেন তবে রক্ত না খাইয়ে খাপে ভরবেন না। আজ পর্যন্ত এই তলোয়ার রক্ত না খেয়ে খাপে ঢোকেনি কখনো। এমনি রক্ত না জোটে তো কুকুর-বেড়াল পোকামাকড় যা হোক একটা মেরে নিয়মটা রাখবেন।'

উদ্ধববাবু রক্ত খাওয়ানোর কথা শুনে তরোয়ালটা কখনো খাপ থেকে বের করেননি। আজ করলেন। দেখে অবাক হলেন, দশ বছর খাপের মধ্যে একটানা বন্ধ থেকেও তরোয়ালটার গায়ে একটুও মরচে পড়েনি। এখনো ঝকঝক করছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অস্ত্রটা হাতে নিলেই শরীরের রক্ত কেমন একটু চনমন করে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে চেপে এক্ষুনি যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু উদ্ধববাবুর ঘোড়া নেই। ধারেকাছে কোথাও কোনো যুদ্ধও হচ্ছে না। তাই তিনি শূন্যে কয়েকবার তরোয়ালটাকে ঘুরপাক খাইয়ে নিলেন। মনে দুর্জয় সাহস এল।

রাত এগারোটার পর তিনজনে বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসলেন। ফ্লাস্কে চা, টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি আর আলুর দম।

ফরহ্যান্স— দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

দাঁত সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাড়ি মজবুত করতে সাহায্য করে

মাড়ির গোলমাল হলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, দাঁত ঠিক মত সাফ না করলে প্লাক নামে জীবাণুর যে পাতলা পর্দা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে, তা জমে ওঠে। এই প্লাক দন্তমলে পরিণত হয়ে মাড়ি দুর্বল ক'রে ঠেলে দেয়, ফলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। মাড়ির গোলমাল সাধারণ স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

2SIF-172 BEN

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার অদ্বিতীয় ফরমুলা আপনার মাড়ি মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। কাজেই, আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

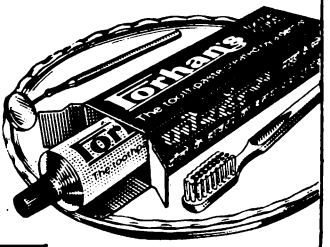

ফরহ্যান্স — মাড়ির জন্যে

Regd. T.M: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

তিনটে নতুন ব্যাটারি ভরা টর্চ।

জাফর মিঞা বললেন, "পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখলে পারতে হে উদ্ধব। বদমাশগুলো যদি দল বেঁধে আসে তাহলে আমরা তিনজন কী করব?"

উদ্ধববাবু বলেন, "সেটা একবার ভেবেছিলাম। তবে একটা পাখির জন্য পুলিশ-পাহারা বসালে লোকে আমাকে পাগল ভাববে। তাই অতটা আর করিনি। এমনিতেই আজ আদালতে আমার সম্পর্কে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হাকিম।"

ভালমানুষ জাফর মিঞা কী বুঝলেন কে জানে। শুধু বললেন, "তা ভাল। তা ভাল।"

রাত বারোটার মধ্যেই জাফর মিঞা ঢুলতে লাগলেন। রামু প্রথম দিকটায় তেজে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু বাচ্চা ছেলে, হঠাৎ কোন্ সময়ে শতরঞ্চিতে কোণ ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। উদ্ধববাবু একা।

তবে একা হলেও ভয়ের লেশমাত্র তিনি টের পাচ্ছেন না। হাতের তরোয়ালটা ঝকঝক করছে। শরীরের রক্ত এতই গরম হয়ে উঠেছে যে এই শীতেও তাঁর ঘাম হতে লাগল। তিনি প্রথমে আলোয়ানটা খুললেন, তারপর সোয়েটার ছেড়ে ফেললেন। তাতেও গরম বোধ করায় গায়ের জামাটা খুলে সেটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। গায়ের গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে ঘামে। সেটাও খুলবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় থানার ঘড়িতে একটা বাজবার ঢং শব্দ হল। উদ্ধববাবু তরোয়াল-হাতে পায়চারি করতে-করতে দরবারি কানাড়া রাগের একটি মুখ তৈরি করতে লাগলেন। ভারী গভীর এবং গম্ভীর রাগ। তাঁর গলায় রাগটা খোলেও ভাল। গাইতে-গাইতে বেশ আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। পাখির কথা মনে রইল না, পাহারার কথা মনে রইল না। সুরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তরোয়ালটাও উঠছিল নামছিল। পা পড়ছিল তালেতালে। চোখ বোজা। উদ্ধববাবু স্পষ্টই টের পাচ্ছিলেন, আজ তাঁর গলায় অন্য কেউ ভর করেছে। এ যেন তাঁর সেই পুরনো গলাই নয়। সুরের এক মায়ারাজ্য থেকে রাগরাগিণীর বাতাস ভেসে আসছে। চারদিকে এক সুরের সম্মোহন ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন চোখ মেললেন তখনো তিনি ঠিক বাস্তবজগতে নেই। নিজের সুরের রেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশ অনেকটা সময় গেল ধাতস্থ হতে। তখন অবাক হয়ে দেখেন, রামু উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। জাফর মিঞা ঘন-ঘন চোখের জল মুছছেন। বারান্দায়, সামনের বাগানে, ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তর পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকেই হাঁ করে দেখছে তাঁকে।

উদ্ধববাবু একটু লজ্জা পেলেন। গান তিনি ভালই গেয়ে থাকেন বটে, কিন্তু এত রাতে লোক জড়ো হওয়ার মতো ততটা কি? যাই হোক, তিনি হাতজোড় করে শ্রোতাদের নমস্কার জানালেন।

ঠিক এই সময়ে বেরসিক গবা পাগলা বলে উঠল, "আপনি তো গানের ঠেলায় পাড়া জাগালেন,। ওদিকে যে হয়ে গেছে।"

উদ্ধববাবু মিটিমিটি হেসে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করেন, "কী হল রে আবার?"

"আবার কী? যেনাদের আসবার কথা ছিল তেনারা এসে কাজ হাসিল করে হাওয়া।"

উদ্ধববাবুর মাথাটা আজ বড় ভাল। এই

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির বিশেষ কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

শীতের রাতে গান গেয়ে তিনি সকলের ঘুম ভাঙিয়েছেন। তাঁর সুরের চুম্বকে সকলে ছুটে এসেছে। এই সাফল্যের পর তাঁর এলেবেলে কথা ভাল লাগছে না। তবু গলাটা মিষ্টি রেখেই বললেন, "আরো লোক এসেছিল বুঝি? তা বসতে দিলি না কেন?"

"তারা বসবার জন্য এলে তো বসতে বলব! তারা কাজ গুছোতে এসেছিল, কাজ গুছিয়ে সরে পড়েছে।"

"তাই নাকি?" উদ্ধববাবু তবু গা করেন না।

গবা পাগলা বলল, "আমিও গোয়ালঘরের চালে বসে পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আপনি তরোয়াল ঘুরিয়ে গান ধরেছেন। তরোয়ালের ডগাটা একবার রামুর পেটের ধার ঘেঁষে গেল, আবার জাফরচাচার নাকের ডগা ছুঁয়ে এল। মারাত্মক কাণ্ড। ভাবছি নেমে এসে আপনাকে জাপটে ধরি। ঠিক এই সময়ে তেনারা এলেন। পাঁচ-সাতজন তাগড়া জোয়ান। আপনি চোখ বুজে গানে মত্ত। তারা আপনার চোখের সুমুখ দিয়ে, বগলতলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল যন্ত্র দিয়ে, তারপর চোখের পলকে পাখির দাঁড়টা নিয়ে আপনার সুমুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল। গান যে কী সব্বোনেশে তা আজ বুঝলাম।"

উদ্ধববাবু এখনো সঙ্গীতের সুরলোক থেকে নেমে আসতে পারেননি। চোখে এখনো ঘোর। মিষ্টি করে বললেন, "পাখি নিয়ে গেছে? যাক। পাখি যাক, সুর তো ধরা দিয়েছে। তুই বরং রাঘব ঘোষকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

লোকজনের ভিড় ঠেলে হঠাৎ দারোগা কুন্দকুসুম বারান্দায় উঠে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন, "উদ্ধববাবু, আপনার মতো বিশিষ্ট লোককে হ্যারাস করতে চাই না। কিন্তু আপনার পাড়াপ্রতিবেশীদের কয়েকজন গিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, আপনি গভীর রাতে বিকট চিৎকার করে তাঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমিও থানা থেকে একটা চেঁচানি শুনতে পেয়েছি। প্রতিবেশীরা আপনাকে থামানোর জন্য এসে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু আপনি একটি বিপজ্জনক অস্ত্র ঘোরাচ্ছেন দেখে তাঁরা কেউ কাছে আসতে ভরসা পাননি। তাঁদের ধারণা, আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক অস্ত্র রাখা ও ব্যবহার এবং লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দু-দফা অভিযোগ। আমি আপনাকে গ্রেফতারও করতে পারি। কিন্তু অতটা না-করে আজ কেবল একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর এরকম করবেন না।"

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর উদ্ধববাবু সুরলোক থেকে দড়াম করে বাস্তব জগতে নেমে এলেন। কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাখিটা তবে নিয়ে গেছে?"

গবা বলল, "তবে আর বলছি কী?"

উদ্ধববাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, "তোর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল, তুই কিছু করলি না?"

গবাও সমান তেজে বলে, "সে তো আপনারও চোখের সামনেই নিয়ে গেছে। আমাকে দোষ দিচ্ছেন শুধু-শুধু। আমি একা অতজনের সঙ্গে পারব কেন?"

"চেঁচাতে তো পারতিস!"

গবা হেসে বলে, "আজ্ঞে, আপনার গানের চোটে আর সব শব্দ তো লোপাট হয়ে গিয়েছিল। আমার চেঁচানি শুনবে কে? তবু চেঁচিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার গলার দাপটে আমার চেঁচানি ঢাকা পড়ে গেল।"

জাফর মিঞা হঠাৎ একগাল হেসে বললেন, "উদ্ধব, আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। বুঝলে! হঠাৎ কানের ভিতরকার ঝিঁঝি ভাবটা কেটে গেছে।"

উদ্ধববাবু কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "তাই নাকি?"

"ওঃ, তোমার গান যে কী উপকারী তা আর বলার নয়। প্রথমটায় একটু আঁতকে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু তার পর থেকেই কান ভেসে যাচ্ছে হাজার রকম শব্দে।"

'হুঁ' বলে উদ্ধববাবু তরোয়াল-হাতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন। রক্ত না-খাইয়ে তরোয়াল খাপে ভরা বারণ। উদ্ধববাবু তরোয়ালটার দিকে চেয়ে বললেন, "খাওয়াচ্ছি রক্ত। নে খা।"

বলে তরোয়ালটা নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরলেন। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

তদন্ত চলছে

কার্তিক ঘোষ

বুলটের মা, তিনি হচ্ছেন বাড়ির বড়গিন্নি। তাই কেষ্টর মা গজগজ করতে করতে বললে, "যাই, তেনাকে আগে বলে আসি। তারপর দেখব মুখপোড়াকে!"

কিন্তু দু-তলায় উঠতে যাবে কি একতলায় সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল মেজগিন্নির সঙ্গে। তবে ওকে বলে যে তেমন কোনো সুবিধে হবে না, বোধহয় কেষ্টর মা ভালই জানত। বাড়ির মধ্যে বড্ড ভালমানুষ মেজগিন্নি। একে থপথপে বাতের শরীর, তার ওপর একটু বেশিরকম মায়া-দয়া। বলতে কি মেজগিন্নির জন্যেই ও মুখপোড়া, হাড়হাভাতেটা লাই পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে আজকাল।

সবই জানে কেষ্টর মা। তবু কি রাগ সামলানো যায় চট করে। তাই এক হাতে আঁশবটি আর-এক হাতে মাছের চুবড়িটা নিয়ে মেজগিন্নির মুখোমুখি হতেই বলে ফেললে ব্যাপারটা।

কিন্তু হায় রে কপাল! শুনেই কিনা হেসে ফেললেন মেজগিন্নি। শুধু বললেন, "যাকগে, খাবার জিনিস খেয়েছে তো কী হয়েছে!"

কথা শুনে গা-পিত্তি জ্বলে উঠল কেষ্টর মায়ের। যাকগে বললেই হল! মেজগিন্নির আর কী? কথায় কথায় সাত-সতেরোর হিসেব তো আর দিতে হয় না এই বাড়িতে। পান থেকে চুন খসলেই যত দোষ হয় এই নন্দ ঘোষের। মানে কেষ্টর মায়ের। তাই মেজগিন্নির . ঐ মুচকি-মুচকি হাসিমাখা কথায় কান দিলে আর চলবে না আজকে। বাড়ি মাথায় করতে হবে এই নিয়ে।

দোতলায় আর উঠতে হল না। বড়গিন্নি নেমে রান্নাঘরেই আসছিলেন। বুলটের ইসকুলের ভাত। বড়কর্তার অবশ্য কদিন ছুটি আছে, কিন্তু মেজকর্তা আর ছোটকর্তার অপিস। তাই সকাল থেকেই বাড়িটায় যেন দম ফেলবার একটু সময় নেই। তার ওপর মিনিটে-মিনিটেই বড়কর্তার চায়ের ফরমাশ, মেজকর্তার হিসেব-নিকেশ। সব ছাড়িয়ে বুলটের দুষ্টুমি।

তাই কেষ্টর মাকে মাছের চুবড়ি আর আঁশবঁটি হাতে দেখেই বড়গিন্নির মেজাজ বিগড়ে গেল। বললেন, "তোমার আবার কী হল? একদিন তো বলেইছি শুক্কুরবারটা মাছ খান না বড়কর্তা। ব্যস, সেই বুঝে কাটো।"

কেষ্টর মা কি আর বড়গিন্নির মেজাজ দেখে ঘাবড়ায়। একটানা বারো বছর আছে এ-বাড়িতে। অবশ্য কেষ্ট বেঁচে থাকলে কি আর থাকতে হত এতদিন। ছেলের পয়সায় সে-ও থাকত ছেলে-বৌকে নিয়ে নিজের ঘরে গিন্নি হয়ে।

কিন্তু সে তো আর এ-জন্মে হল না! তাই বোধহয় বুলটেদের বাড়িতেই ছোটখাটো একটা গিন্নিবান্নির মতন কাটিয়ে দেবার আশা কেষ্টর মায়ের। আর সেই জন্যেই বোধহয় বড়গিন্নির গলার ওপর গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, "সেই হিসেবেই তো কেটেছিলুম। কিন্তু ধুতে গিয়েই দেখি সেই পেটিটাই নেই!"

পেটির কথা শুনেই মেজকর্তা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বড়গিন্নি আরো রেগে গেলেন তখন। বললেন, "মাছ কাটতে না-কাটতেই কিনা একটা পেটি গায়েব হয়ে গেল তোমার সামনে থেকে!"

কেষ্টর মা বললে, "তাহলে আর বলছি কী?"

বড়গিন্নি আরো রেগে উঠলেন শুনে। গলাটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, "তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে নাকি?"

মেজকর্তা অমনি হিসেবের খাতাটা খুলেই ফড়ফড় করে বলে ফেললেন এক হপ্তার বাজারদর।' নিজের ঘরে সকালের কাগজ পড়ছিলেন বড়কর্তা। কাগজ হাতেই নেমে এলেন। বুলটের অঙ্কটাও মিলছিল না সকাল থেকে। সে-ও দেখলে এই সুযোগ। শুধু কেষ্টর মা যখন মাছ কাটার কথাটা বলতে-বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে তখন ছোটকর্তা আস্তে-আস্তে নেমে এলেন দোতলা থেকে। হাতে একটা কলম আর নোটবুক।

বুলটেও জানে, ওর ছোটকাকা একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করেন মাঝে-মাঝে।

সে-বছর বুলটের পুজোর নতুন একপাটি জুতো হারানো নিয়ে বাড়িময় যখন হৈ-চৈ আর হল্লার একশেষ, তখনই কয়লার বাক্সোর কাছ থেকে বার করে দিয়েছিলেন ছোটকা। মায়ের জর্দার কৌটোটাও একবার অমনি বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। কেষ্টর মা-ও জানে। ছোটকর্তাই সেবার পাত্তা করে দিয়েছিলেন ম্যাজিকের মতন।

তাই বোধহয় ছোটকর্তাকে দেখেই বুকে একটু ভরসা পেল কেষ্টর মা। কান্না থামিয়ে বললে, "মাছটা কেটেকুটে রেখে আমি একটু দোক্তা মুখে দিতে গেছি গো দাদাবাবু···আর সেই তক্কেই কি না—"

ছোটকর্তা বললেন, "চলো, জায়গাটা দেখতে হবে আগে—"

কেষ্টর মা কলতলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখনো একমুঠো ছাই, আর মাছের আঁশ-কাঁটা পড়ে আছে।

ছোটকর্তা বুলটেকে বললেন, "দ্যাখ ভাল করে, ওখানে কোনো পায়ের দাগ আছে কি না!"

মেজকর্তা বললেন, "কমপক্ষে পঁচিশ গ্রাম এক পিস মাছের পেটির দাম এখন পাক্কা তিপ্পান্ন পয়সা! মুখের কথা!"

মেজগিন্নি বললেন, "কী দরকার অত হাঙ্গামা করে। আমি না-হয় মাছ খাব না আজকে।"

বড়গিন্নি আবার খেপে উঠলেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, মাছের হিসেব আমার চাই।"

ছোটকর্তা এবার ধমকে দিলেন সবাইকে—"গোলমাল করলে কখনো চোর ধরা যায় নাকি?"

কেষ্টর মা প্রায় আগেভাগে নামই করে ফেলল চোখ মুছতে গিয়ে। বললে, "আমি বলছি দাদাবাবু, ওটা ঐ হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে মুখপোড়াটার কম্মো!"

বড়কর্তা বললেন, "কার কথা বলছ?"

বুলটে বুঝে নিলে কেষ্টর মা কাকে ধরতে চাইছে চোর বলে। কিন্তু মুখে কিছু বললে না। ছোট্‌কা বকবেন।

কেষ্টর মা বোধহয় নামটা করতে যাচ্ছিল ফট করে। কিন্তু ছোটকর্তা এক দাবড়ি দিলেন তাকে।

মেজকর্তা বললেন, "যে-ই হোক খুন করা উচিত তাকে।"

ছোটকর্তা এবার হাওয়ায় যেন কিসের গন্ধ শুঁকলেন একবার, তারপর বুলটের দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝতে পারছিস কোনো পায়ের ছাপ?"

বুলটে যদিও ওর বেড়ালটাকে খুবই ভালবাসে, তবু ছোট্‌কার ভয়ে ঘাড়টা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ। বেড়ালের।"

কেষ্টর মা অমনি আঁশবঁটি বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বললুম তো ও-পোড়ারমুখো ছাড়া এ-কাজ আর-কেউ করতে পারে?"

বড়কর্তার আর-এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হল না। বেরিয়ে পড়তে হল বেড়ালটাকে খুঁজতে!

মেজকর্তা বললেন, "ওকে আজ গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে তবে অপিস যাব।"

বড়গিন্নি একটা ছেঁড়া চটের ব্যাগ খুঁজতে চলে গেলেন ভাঁড়ার-ঘরে। কিন্তু বুলটের সেই সাদা ধবধবে গোঁফছাঁটা বেড়ালটাকে আর তখন খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও।

বুলটে ইসকুলে চলে গেল। কিন্তু মন পড়ে রইল বাড়িতে। আহা রে! বেচারি বেড়ালটা! দিনরাত কেমন মিউ মিউ করে ঘুরঘুর করত বুলটের পিছন-পিছন। বিস্‌কুট দিত বুলটে। দুধমাখা ভাত দিত মাকে লুকিয়ে। মাছের কাঁটাও দিত তার সঙ্গে। তবু কিনা আজ একটা সামান্য মাছের পেটি চুরি করে খেতে গেল! ইস! না খেলে কী হত শুনি? সব্বাই যে চোর বলছে এখন?

সারাদিন তাই উসখুস করে ইসকুলে কোনোরকমে কাটল বুলটের। বিকেলে ফিরে আবার শুনলে, এক বাটি দুধও নাকি কখন খেয়ে পালিয়েছে বেড়ালটা।

বুলটে কী খাবে এখন? মা রেগে কাঁই কাঁই করছেন বাপির ওপর। বাপিই যেন কোত্থেকে একদিন বুলটেকে এনে দিয়েছিলেন ঐ বেড়ালটা! খুব ছোট্ট তখন। একেবারে তুলতুলে। ঠিক যেন সাদা উলের বল একটা।

কেষ্টর মা একলাই বাড়ি মাথায় করছে বেড়ালটাকে নিয়ে। অপিস থেকে ফিরেই মেজকর্তা এক বাটি দুধের দাম হিসেব করতে বসে গেলেন।

ছোটকর্তা সন্ধেবেলা ফিরেই একটা টর্চ আর নোটবুক নিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে পড়লেন মোড়ার ওপর।

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ মেজকর্তার গলা পাওয়া গেল, "চোর! চোর!"

বড়কর্তা ধড়মড় করে উঠেই সুইচ টিপে দিলেন। না। আলো জ্বলল না।

বড়গিন্নি বুলটেকে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, "জানতুম, এত লোডশেডিং যখন, চোর না এসে পারে?"

কেষ্টর মা কিন্তু সকালের সেই আঁশবঁটিটা নিয়েই অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বড়কর্তা দেশলাই পেলেন। কিন্তু মোমবাতি কোথায়? মোমবাতি?

টর্চ নিয়ে নামতে ছোটকর্তারও দেরি হয়ে গেল। কারণ, ঘুমের ঝোঁকে শোবার সময় নোটবুকটা যে কোথায় রেখেছিলেন মনে পড়ছিল না।

কিন্তু শেষ-মেশ সব্বাই যখন মেজকর্তার ঘরের সামনে হাজির হলেন, তখন চোর ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।

জানতে পেরে বুলটেও নেমে এল মায়ের সঙ্গে। কিন্তু খাটের তলায় কাঁচের ভাঁটার মতন চোখ দুটো যার জ্বলজ্বল করছে, সেই কালো বেড়ালটা আবার কোত্থেকে এল?

কেষ্টর মা বললেন, "এই যে মুখপোড়া! কালটা।খাটের তলায় ঢুকে সরের নাড়ু খেতে এসেছ?" বলেই আঁশবঁটিটা এমন ছুঁড়ে মারলে যে কালো বেড়ালটার কানে লেগে একটা চিনেমাটির ডিশ ঝনঝন করে ভেঙে গেল।

মেজকর্তা তখন আর হিসেবের খাতাটা বার করতে গেলেন না। মুখে-মুখেই হিসেব করলেন, ছ-ছটা সরের নাড়ু আর ঐ রকম একটা চিনেমাটির প্লেট। সাড়ে-তিনের কমে হবে না।

কিন্তু ছোটকর্তা সব্বাইকে সরিয়ে দিয়ে যেই খাতায় একটা নোট নিতে গেলেন মোমবাতির আলোয়, অমনি বড়কর্তার পায়ের ফাঁক দিয়ে কেষ্টর মাকে টপকে সটকে পড়ল কালো বেড়ালটা।

চার-পাঁচ দিন পরে হঠাৎ হৈহৈ করে ছুটে এল একদিন বুলটে। এই তো, ফিরে এসেছে তার বেড়াল! কী মজা!

কেষ্টর মা আহ্লাদে এবার আটখানা। "দেখুন দাদাবাবু, দেখুন, ওর সঙ্গে কেমন তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা!"

"কী আশ্চর্য," চায়ের নেশা কেটে গেল বড়কর্তার। বললেন, "ও কোথায় ছিল তাহলে এ কদিন! কোত্থেকেই বা ফিরে এল এমন সময়!"

হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন ছোটকর্তাও। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না কাউকেই।

আমি জানি, তদন্ত করছেন তিনি এখনো। অবশ্য খুব গোপনে। বুলটেও জানে না। তোমাদেরই শুধু বলে ফেললুম চুপিচুপি। সাবধান, তোমরা যেন আবার বলে দিও না কাউকে।

ছবি দেবাশিস দেব

জলবল

জীবিতেশ চক্রবর্তী

ওরে বাবা, এ যে বড়
বিচ্ছিরি বিষ্টি!
থামবার নাম নেই
এ কী অনাছিষ্টি!
মাঠ জলে থৈ-থৈ,
আকাশটা ছলছল—
ফুটবল চলবে না,
আয় খেলি 'জলবল'।
খেলিসনি কক্ষনো?
দেখিসনি খেলতে?
গোলদিঘি-হেদুয়ায়
যাসনি কি মেলতে
দুপুরের ভিজে মন,
কোনোদিন বিকেলে?
চকচক করে জল
রোদ্দুর-নিকেলে—
ভাসমান গোলপোস্ট,
সাঁতারুরা খেলছে,
পায়ে বল মারছে না,
হাতে করে ঠেলছে।
'ওয়াটারপোলো' হল
জলে নেমে ফুটবল—
দলবল মিলে চল্
খেলি সেই 'জলবল'।
আমরা দুজন, আর
কোলাব্যাঙ দশটা,
'জলবল' খেলি আয়,
দেখবি কী রসটা!
ব্যাঙ যদি ঠ্যাং তুলে
শট মারে বলটায়
'লেগবল' দেবে নাকি
রেফারীর কলটায়?

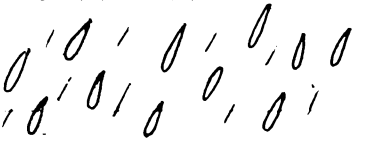

শৈলেন ঘোষ
আর এ-যুগের রূপকথা

শৈলেন ঘোষ এ-কালের একমাত্র সফল শিশুসাহিত্যিক, যিনি বাংলা রূপকথার আবহমান ধারাটিকে একক প্রচেষ্টায় বহন করে চলেছেন। তাঁর চরিত্ররা কেউই অচেনা নয়, কিন্তু তাদের নিয়ে যে-ভঙ্গিতে তিনি গল্প বলেন সেই ভঙ্গিতে মিশে থাকে রূপকথার এক অপরূপ মেজাজ। ঠিক এই মেজাজে এখনকার কোনো সাহিত্যিক ছোটদের জন্য লেখেন বলে মনেই পড়ে না। মানুষ, বাঘ, বাঁদরছানা, ডাইনিবুড়ি, কুমির, পাখি, মাছ, নদী—এরা সবাই তাঁর গল্পে অবাক-করা চরিত্র। দক্ষিণারঞ্জন বা অবন ঠাকুর—এরাই তাঁর আদর্শ, এঁদের ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরী তিনি।

নতুন বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সমগ্র কিশোর সাহিত্য ২য়
দাম ২৫·০০

সত্যজিৎ রায়ের
হত্যাপুরী
দাম ৮·০০

আশা দেবীর
আসল টেনিদা
দাম ১০·০০

আরো অনেক বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঃ আগ্রা যখন টলমল ৫·০০ যার নাম ঘনাদা ৬·০০ ঘনাদার ফুঁ ৬·০০ তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০ ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০ শৈলেন ঘোষের ঃ অরুণ বরুণ কিরণ মালা ৪·০০ মিতুল নামে পুতুলটি ৬·০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৭·০০ বাজনা ৬·০০ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬·০০ আমার নাম টায়রা ৬·০০ আজব বাঘের আজগুবি ৭·০০ জাদুর দেশে জগন্নাথ ৮·০০ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ঃ ভয়ের মুখোশ ৬·০০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭·০০ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০·০০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঃ ভূমিকম্পের পটভূমি ৫·০০ ইন্দ্রমিত্রের ঃ বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬·০০ শরৎ-কথামালা ১০·০০ পূর্ণেন্দু পত্রীর ঃ কী করে কলকাতা হলো ৫·০০ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫·০০ কলকাতার রাজকাহিনী ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

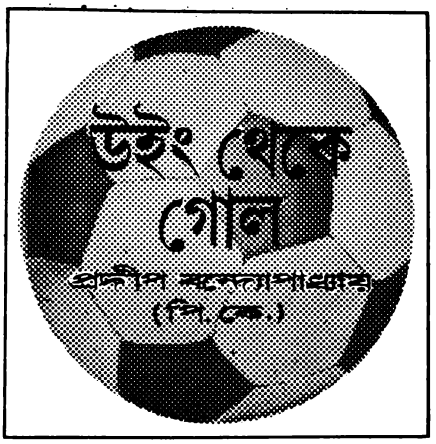

॥ ২৪ ॥

তোমাদের আগেই বলেছি, মেলবোর্ন অলিম্পিক আমার কাছে শুধুমাত্র নিজেদের খেলার জন্যই স্মরণীয় নয়। খেলার জগতের যেসব প্রবাদপুরুষকে দেখার সৌভাগ্য হল, মেলবোর্নে না গেলে তা তো নেহাত স্বপ্নই থেকে যেত।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত ইয়েন কারমশের নাম শোনোনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৃষ্ণকায় বাসকেট-বলারের উচ্চতা ছিল সাত ফুট সাড়ে ছয় ইঞ্চি। চকচকে কালো গায়ের রঙ, বিশাল চেহারা। 'হিউম্যান মাউনটেইন' নামে খ্যাত কারমশের জন্যই শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাসকেটবল ফাইনালে সোভিয়েট রাশিয়াকে দুই পয়েন্টে হারাল।

একদিন সকালে আমি আর হায়দরাবাদের জুলফিকার অলিম্পিক ভিলেজের রাস্তায় আস্তে-আস্তে দৌড়োচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনেই দৌড়ে চলেছেন বিখ্যাত দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক। পরিচয়টা জেনেই জুলফিকার বললেন, "চলো, ওঁর সঙ্গে দৌড়োই।" পিছন-পিছন আমাদের দৌড়োতে দেখে জ্যাটোপেক হাসতে-হাসতে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকলেন। জ্যাটোপেক তখন দশ হাজার মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। ভিলেজের মধ্যেই কয়েকবার চক্কর দিয়ে তিনি বাইরে বেরোলেন। যেন সম্মোহিত হয়ে আমরা দুজনও বেরিয়ে পড়লাম। জ্যাটোপেক যেন ভেসে চলেছেন হাওয়ায় পালকের মতো, কিন্তু আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। জুলফিকার শেষ দেখতে চান। আমি বললাম, "শেষ দেখা আমাদের কর্ম নয়, জ্যাটোপেক এখন বিশ-ত্রিশ মাইল এই ভাবেই দৌড়বেন!"

যেন কিছুটা অনিচ্ছা নিয়েই জুলফিকার ফিরে আসতে রাজি হলেন। শুধু বললেন, "একদিন সাইকেল নিয়ে এই লোকটার সঙ্গে যেতে হবে।"

আর-একদিন সকালে মন দিয়ে প্যারি ওব্রায়েনকে দেখছিলাম। পর পর দুটি অলিম্পিকে শটপাটে সোনা-পাওয়া বিশালদেহী ওব্রায়েন খুব রাশভারী প্রকৃতির ছিলেন। কারো সঙ্গেই বিশেষ কথা বলতেন না। সেই ওব্রায়েন দেখতে পেলেন, একটু দূরে একজন চেক মহিলার শটপাটের অ্যাকশনে কিছু ভুল হচ্ছে। গম্ভীর ওব্রায়েন ধীরপায়ে সেইদিকে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন, নির্ভুল 'অ্যাকশন' কাকে বলে। তারপর ফের নীরবে নিজের অনুশীলনে মন দিলেন।

একমনে ওব্রায়েনের অনুশীলন দেখছি, হঠাৎ একটি বিশাল হলডেন গাড়ি কাছেই এসে দাঁড়াল। চমৎকার স্বাস্থ্যবান একজন কৃষ্ণকায় মানুষ সেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

কোথায় যেন দেখেছি এঁকে! মানে, ছবি দেখেছি। প্রায় ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জেসি ওয়েন্স?

পৃথিবীর সর্বকালের সেরা অ্যাথলীট জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। তুমি তো দেখছি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছ। জানো, কিছুদিন আগে আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম?"

রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবছিলাম, এই মানুষটির জন্যই উনিশশো ছত্রিশ সালে বার্লিন অলিম্পিক স্টেডিয়াম থেকে হিটলারকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। একজন কালো মানুষের এত আধিপত্য হিটলার সহ্য করতে পারেননি। একটা নয়, দুটো নয় —অ্যাথলেটিক্সে চারটি সোনা জিতে নিয়েছিলেন জেসি ওয়েন্স। ওয়েন্স শুধু বড় অ্যাথলীটই ছিলেন না, বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবেও তাঁকে দেখতে চেয়েছে দুনিয়ার মানুষ। সর্বকালের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কে? কয়েক বছর আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছেন ফুটবল-সম্রাট

বীরাঙ্গনা

জয়িতা মিত্র

ক্ষান্তবুড়ির এক বোন গিয়ে
পূজার বন্ধে নাসিকে
ঝগড়ায় হেরে গরম দুপুরে
কিলচড় মারে মাসিকে।

রন-পায়ে চড়ে সে-দেশের রাজা
তক্ষুনি এসে দেন তাকে সাজা,
তবু সে সাহসী, দাঁতে মাখে মিশি,
ভয় সে করে না ফাঁসিকে,
মশানে এসেও গান জুড়ে দেয়
গিটকিরি-অলা ক্লাসিকে।

ছবি অহিভূষণ মালিক

পেলে। তার পরেই অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্সের স্থান।

মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন মহিলা অ্যাথলীট লীলা রাও। শাড়ি-পরিহিতা অনিন্দ্যসুন্দরী লীলা রাওয়ের ছবি অস্ট্রেলিয়ার সব পত্রিকাতেই ছাপা হচ্ছিল। একশো মিটার দৌড়ের হিটে যেদিন লীলা দৌড়োবেন, আমরাও স্টেডিয়ামে হাজির হলাম। আমরা মানে—আমি, নিখিল নন্দী, সমর ব্যানার্জি, কেষ্ট পাল আর নেভিল ডিসুজা। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, লীলা রাও সম্ভবত একটি পদক জিতে নেবেন।

হায়! কয়েক মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন লীলা রাও। হতাশ হয়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরোবার চেষ্টা করছি, বদ্রুদা (সমর ব্যানার্জি) বললেন, "ঐ তো, ওপরে পঙ্কজদা দাঁড়িয়ে আছেন। চলো, সবাই মিলে দেখা করে আসি।"

ভারতের এই কর্মকর্তাটি পৃথিবীর সব দেশেই অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। দেখলাম, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা পঙ্কজ গুপ্ত একজন ছোটখাট চেহারার সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। পঙ্কজদার পরনে ডেক্রনের স্যুট, হাতে পানের ডিবে। তাঁর সঙ্গের সাহেবকে দেখেও সেই শিহরন জাগল—কোথায় যেন দেখেছি!

পঙ্কজদা ঘদ্রুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের প্র্যাকটিস ঠিকমতো চলছে তো?" তারপর হঠাৎ সেই সাহেবের হাত ধরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সরি, প্রথমেই আলাপ করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। মীট মাই ফ্রেণ্ড—ডন ব্র্যাডম্যান।"

নেহাত সাহেব, নইলে তখনই পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম! এই সেই ক্রিকেটার, পৃথিবীর যে-কোনো টেস্ট-দলের অধিনায়ক যাঁর নামে একশো রান লিখে দিতে রাজি থাকতেন—যদি তিনি ব্যাট না করেন!

পঙ্কজদাকে বললাম, ভাল ক্রিকেট ব্যাট কিনতে চাই। একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে দিলেন দ্য গ্রেট ডন। সেই চিঠি নিয়ে আমি আর বদ্রুদা বিখ্যাত ক্রিকেটার লিণ্ডসে হ্যাসেটের বিরাট দোকানে গেলাম। সেখানে সেলস ম্যানেজার হিসেবে সব কাজের দেখাশোনা করছেন আর

এক বিশ্ববরেণ্য ক্রিকেটার—নীল হার্ভে।

ভারতে ফেরার আগে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলতে হল। কথা পাওয়া গিয়েছিল, এই ফিরতি ম্যাচেও ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারলে, দেশে ফেরার পথে যুগোশ্লাভিয়া কলকাতায় ভারতীয়দের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে যাবে।

কিছুটা সুস্থ থাকায় এই ম্যাচে খেললাম। আমাদের টীমের প্রায় সকলেই দুর্দান্ত খেললেন। আমরা জিতলাম ৭—১ গোলে। কিট্টু, নেভিল ডিসুজা এবং আমি দুটি করে গোল করলাম। একটি চমৎকার গোল করলেন অধিনায়ক সমর ব্যানার্জি।

ফেরার পথে যুগোশ্লাভিয়া দল কলকাতায় আই এফ এ একাদশের বিরুদ্ধে খেলল। পরিষ্কার দুই গোলে হারলেও আমাদের খেলা খারাপ হয়নি। যুগোশ্লাভ কোচ খেলার প্রশংসা করে বললেন, আমাকে অবিলম্বে ইউরোপে পাঠানো উচিত। ইউরোপে গেলে হয়তো সত্যিকারের বড় ফুটবলার হতে পারতাম। এখন ভেবে দুঃখ হয়, কিন্তু তখন তো যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

সিডনির ঐ ছেলেটিকেও আমি কখনও ভুলব না। বাচ্চা ছেলেটি রোজ সকালে একটা সুন্দর সাইকেলে চেপে পত্রিকা বিক্রি করতে আসত। হাঁক দিত, "হেই পেপার!" ছেলেটি দেখতেও চমৎকার। মাঝে-মাঝে ফল বা কিছু দিতে চাইলে নিত না। সিডনিতে আমরা দিন-সাতেক ছিলাম। ফেরার দিন সকালে ওকে বললাম, "তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়।"

"কেন?"

"এত অল্প বয়স থেকেই তোমাকে কাজে নেমে পড়তে হয়েছে, তাই।"

জেসি ওয়েন্স ও প্রদীপ। মেলবোর্ন

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, "আমি সিক্সথ স্ট্যাণ্ডার্ডে পড়ি। আমার বাবা ইঞ্জিনীয়ার। মা কোম্পানি সেক্রেটারি। আমাদের তিনটে গাড়ি আছে। নিজে পয়সা জমিয়ে আমি ইংল্যাণ্ডে পড়তে যেতে চাই। তাই সকালে এই সুন্দর সাইকেলটায় চেপে কাগজ বিক্রি করি, লাভের পয়সা জমাই। জানেন, এই সাইকেলটাও আমি নিজের পয়সায় কিনেছি।"

অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখলাম। আর ভাবলাম, বাড়িতে তিনটে গাড়ি, এত বড়লোক, তবু সকালে কাগজ বিক্রি করছে—এমন ব্যাপার এ-দেশে ভাবা যায়? (ক্রমশ)

বছর কুড়ি আগে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটা ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানীরা একবার মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। কোন একটা তারা থেকে যে আলোক-রশ্মি আসছে সেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বর্ণালিতে এমন কতগুলো দাগ দেখতে পেলেন যেগুলোর কোনোমতেই ওখানে থাকা উচিত নয়। যতবার তাঁরা পরীক্ষাটা করতে যান, ততবারই সেই ভুতুড়ে দাগগুলো সামনে হাজির। কিছুতেই আর তাঁরা এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পান না। শেষকালে আমেরিকাতে কালিফর্নিয়ায় বিজ্ঞানীদের হাতে রহস্যটা ধরা পড়ল। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, পরীক্ষা করবার সময়ে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা সিগারেট ধরাবার জন্যে যে দেশলাই জ্বালছিলেন, তার শিখা থেকেই ওই দাগগুলোর উৎপত্তি।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু

আয়নার সামনে কথা

বাচস্পতি

ভণ্টু কী যেন ভাবল একটু। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকু, গলার আওয়াজের রহস্য না-হয় বুঝলাম, কিন্তু কথা হয় কী করে? শুধু আ-আ-আ আওয়াজ করলে তো কথা হয় না!"

"ব্রিলিয়ান্ট!" খুব খুশি হয়ে জ্বলজ্বল করে ভণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হিগিন। "তোমাকে শিষ্য হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত।" বলে আদর করে ভণ্টুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিলেন, তারপর হাসিমুখে বললেন, "ঠিক কথা! স্বরতন্ত্রীর কাজ হল আওয়াজ করা, গলাটাকে বাজানো—বাঁশি যেমন করে বাজায়। আর জিভ আর ঠোঁটের কাজ হচ্ছে ঐ আওয়াজকে কথার চেহারা দেওয়া। বাঁশির ফুটোগুলো নানারকম করে টিপে যেমন নানারকম সুর বার করতে হয়, তেমনি কথাও বার হয় জিভ আর ঠোঁটের কারিগরিতে। তার মধ্যে আবার জিভের কাজই বেশি।"

"তা এরা করে কী?"

এবার হিগিনকাকু যেন রেগে উঠলেন একটু। বললেন, "আরে পোলাপান, কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? তুমি নিজেই দিব্যি কথা বলতে পারো। একটু কথা বলো, বলে বুঝে নাও জিভ আর ঠোঁট কী করছে। আয়নাটা আবার মুখের সামনে ধরো, আর ভাবতে থাকো ঘটনাটা কী ঘটছে?"

ভণ্টুর সংকোচ একটু কমেছে। সে আয়নাটা মুখের সামনে ধরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "ঘটনা কী ঘটছে! বলো তো বাপু আয়না!"

হিগিনকাকু গম্ভীর স্বরে বললেন, "তা আয়না কী বলছে!"

ভণ্টু বলল, "আয়না বলছে, এই দেখুন ভণ্টুবাবু, আপনার জিভের নানা জায়গা মুখের ছাদে ঠেকছে, বাতাস বেরোবার রাস্তা বন্ধ করছে, ছাড়ছে। শেষদিকে ঠোঁটদুটোও বন্ধ হচ্ছে।"

হিগিন বললেন, "ঠিক। আয়না অতি সত্যবাদী! ঐ হল কথার আওয়াজের রহস্য। গলা থেকে আওয়াজ বয়ে বাতাস আসছে মুখে। এবার জিভ তাকে আটকে দিচ্ছে,ছাড়ছে, ঠোঁট তাকে আটকে দিচ্ছে, ছাড়ছে। ঠোঁট আটকে ছেড়ে দিলে একধরনের আওয়াজ, জিভ আটকে ছেড়ে দিলে আরেকরকমের আওয়াজ। যখন আটকে দিচ্ছে তখন কিন্তু আওয়াজ নেই, ছাড়লেই আওয়াজ শুনতে পাই। আটকানোর এক-একটা জায়গা ঐ বাঁশির এক-একটা ফুটোর মতন।" হঠাৎ হিগিনকাকু খুব আবেগ দিয়ে একটা ছড়া আউড়ে গেলেন

"অ - আ - ই - উ
চিল্লাতা হ্যায় কিউ?
জিভ ভেংচে এ-ও
বলল, কলা খেয়ো।"

তারপর তিনি ভণ্টুকে বললেন, "আচ্ছা বাছাধন, এবার বলো তো, ঐ যে আমি অ-আ-ই-উ আর এ-ও বললাম, ওখানে মুখের রাস্তাটা কে আটকাচ্ছে?"

ভণ্টু বলল, "ও, আমাকে ঠকানো হচ্ছে! কেউ তো আটকাচ্ছে না—আওয়াজ সোজা বেরিয়ে আসছে!"

হিগিনকাকু বললেন, "তো তোর ঠোঁট আর জিভ করছেটা কী? লাম্বা হয়ে লিদ্রা দিচ্ছে?"

ভণ্টু লজ্জিত হয়ে আবার আয়নাটা ধরল মুখের সামনে। আগের মতোই দেখল, অ-আ ইত্যাদি বলবার সময় ঠোঁট কখনো নানা সাইজে গোল চেহারা নিচ্ছে, আবার কখনো দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর জিভও ভেতরে বেশ ব্যস্ত। কিন্তু মুখের পথ পুরো আটকাচ্ছে না কোথাও।

"মানে তোমার হল গিয়ে ওর নাম কী, ঐ আওয়াজটা যদি মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার পরিষ্কার পথ পায়, না ঠেকে কোথাও, তাহলে তুমি সেই জিনিস উচ্চারণ করতে পারবে যার নাম স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে ভাওয়েল (vowel)—কিন্তু এর 'ভ'-টা বাংলা 'ভ' নয় মনে রাখিস। ঐ স্বরধ্বনি—"

ভণ্টু থামিয়ে বলল, "স্বরবর্ণ বলো! আমরা তো তাই পড়েছি!" হিগিনকাকু অধৈর্য হলেন একটু, "আরে শাখামৃগ, স্বরবর্ণ হলে লেখার যে-চেহারা। মুখের আওয়াজটা হল ধ্বনি। আওয়াজটা স্বরধ্বনি, লেখার অক্ষরটা স্বরবর্ণ।" (ক্রমশ)

দরকারের কথা

প্রসাদ

বাবা একটা মস্ত মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে বসেছিলেন। চম্বল এসে সামনে দাঁড়াল।

"Yes, Chambal?"

"Daddy, I need a new pair of sports shoes."

"You do? What's happened to the old pair?"

"They're quite worn out, Daddy."

"Really? Then you'll have to get a new pair, I suppose."

"And my bicycle needs a new tyre."

"And what else do you need?"

Chambal tried to think of other things that he needed.

"Oh yes, Daddy, I also need a new geometry box."

"The list does grow, doesn't it?"

"That's all, Daddy. I don't need anything else just now."

"I'm relieved. For a moment I thought you were trying to invent needs."

"Oh no, Daddy. I never ask for things I don't really need."

"Good boy. And now run along, will you? I'm busy."

চম্বল তার পড়ার টেবিলে ফিরে এল। কিন্তু মনে-মনে সে ঠিক করল, কাল সকালে বাবাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

He will need to remind Daddy about the shoes and the geometry box.

But he needn't bother him about the bicycle tyre just yet. The old tyre is a little worn out. But he'll make do with it. All it needs is a bit of patching up. And he'll not need to go far for it. There's a cycle-repair shop quite close by.

কিন্তু এদিকে যে ইস্কুলের কাজ বাকি, তার কী হবে? সাইকেলের ভাবনায় সে-কথা তো চম্বল ভুলেই গিয়েছিল।

He needed to finish the sums.

But he wouldn't need much time to do them.

"What else needs doing tonight?" he asked himself.

"Oh yes. I have to draw a map."

"But before that the pencil needs sharpening."

"I badly need a pencil-sharpener."

***

এবারে এই কথাটার ব্যবহার লক্ষ করো:

NEED

I.(a) I need new shoes.
(b) I badly need a pencil-sharpener.
(c) I don't need anything else.
(d) The cycle-tyre needs patching up.

II.(a) Chambal needn't bother Daddy.
(b) He needed to finish the sums
(c) He will not need to go far.

বাঘা

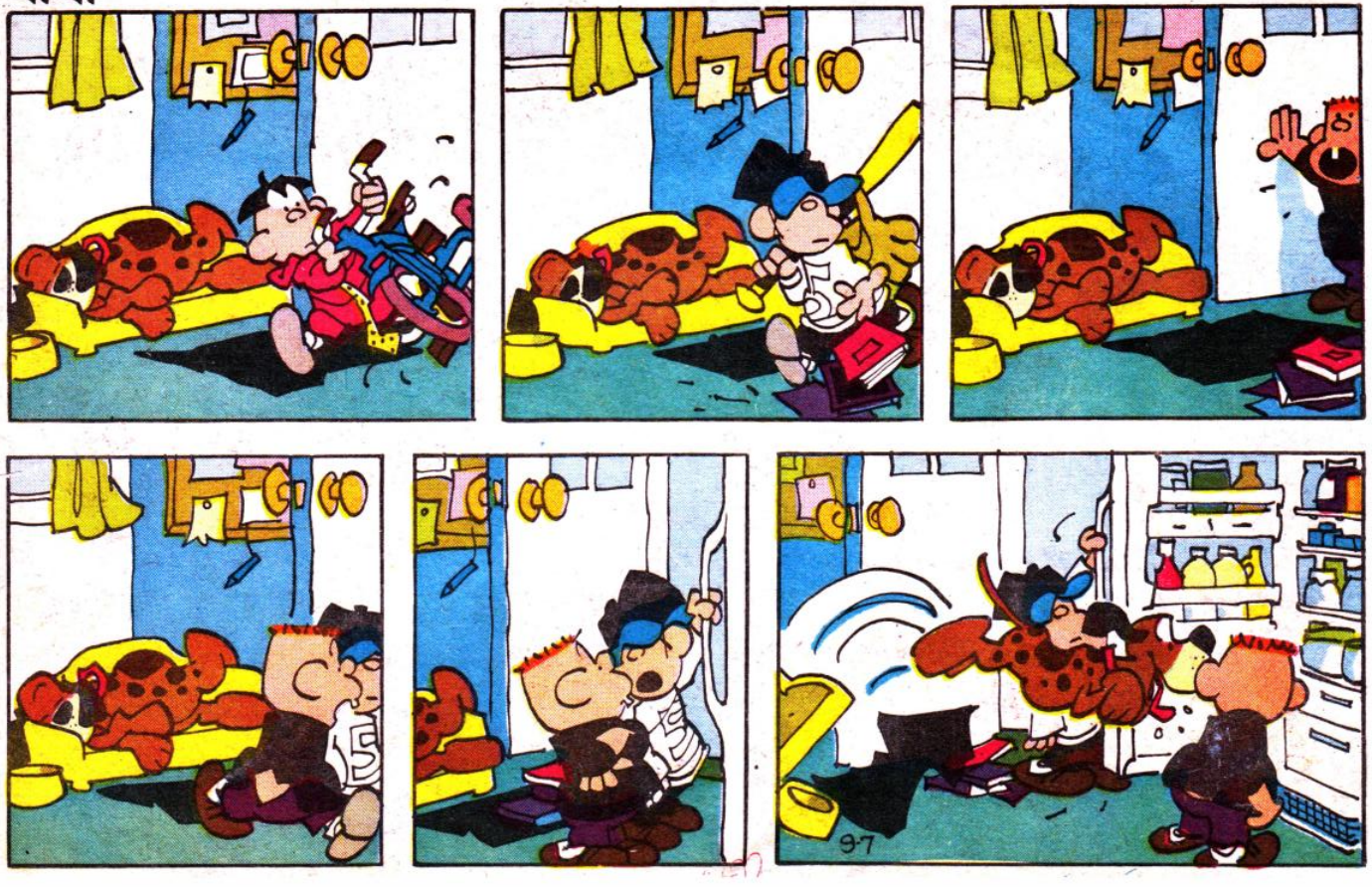

গাবলু
ফুল
ফুল

ডিম থেকে পাখি

ডিমকে মাঝ-বরাবর ভাগ করে দেখেছ পাখি নানানভাবে তোমার কাছে ধরা দিয়েছে, এবার নমুনায় দ্যাখো ডিমকে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে ওপরের অংশ আর নীচের অংশ কেমনভাবে আকার পেল।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ডবোর্ডের কাজ : বাক্স—২

গতবার পেয়েছ বাক্সের আকার। এবার সেই বাক্সের ভেতরটা ভাগ করে নাও কয়েকটা খোপে। প্রত্যেক খোপে রাখো তোমার ইচ্ছেমতো জিনিস।

তৈরি বাক্সের ভেতর দিকের চার পাশের, আর উচ্চতার মাপ নিয়ে চার টুকরো বোর্ড নাও (১নং ছবি)। এবার যে কটা খোপ চাও সেইমতো ঐ টুকরো বোর্ডগুলোকে ভাগ করে নিয়ে এমনভাবে চিরে নাও যাতে একে অপরের খাঁজে শক্তভাবে বসে যেতে পারে। এবার দ্বিতীয় নমুনায় নজর দিলেই বুঝবে কেমনভাবে বসানো হয়েছে। এবার তৈরি-বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই (৩নং ছবি) বাক্সটি ব্যবহারের মতো হয়ে গেল।

জেনে রাখো—(১) টুকরো বোর্ডগুলোকে খোপের জন্য চেরার সময় মনে রাখবে একটি নীচের দিকে কাটলে অপরটি ওপর দিকে হবে। এটি খেয়াল না রাখলে খোপ কখনই মিলবে না। (২) তৈরি খোপ বাক্সে বসানোর সময় একটু আঠা দিয়ে বসালে শক্ত হবে। (৩) ইচ্ছেমতো মাপের হেরফের করে খোপ বড়-ছোট করা যায়।

—কারিগর

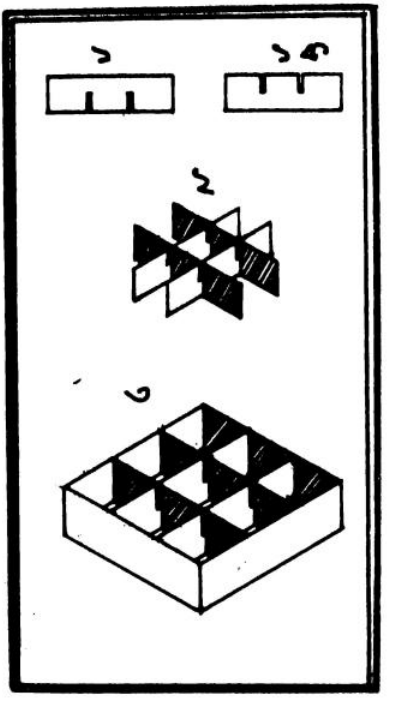

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

Regd No WB/CC/264.MH-BY-SOUTH 683 ANANDAMELA 15 July 1981

daCunha/LIC/107 BEN